সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

কোনও বিনিয়োগ না করেই ৩০০ কোটি টাকা

আয় রবার্ট বঢ়রার □ ৯

নানা সংকটে জর্জরিত রাজ্য □ ১০

খোলা চিঠি : স্বপ্নের পোলাওয়ে ইচ্ছে মতো ঘি ! □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

অপরাধপ্রবণ জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে দেশ শাসন কি সম্ভব ? □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির দুর্গোৎসব □ বাণীব্রত মিত্র □ ১৪

বাঁকুড়ার রাজবাড়ির দুর্গোৎসব □ অর্ণব নাগ □ ১৬

পুরুলিয়ার জয়পুর রাজপরিবারের স্বর্ণদুর্গার পূজা □ ১৮

পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজার দুর্গোৎসব □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৯

পুজোর নারীর সাজসজ্জা □ মিতা রায় □ ২৬

পুজোর পাঁচালী □ কৃষ্ণকলি মুখার্জী □ ২৭

নীরবতার অর্থ যখন ভীরুতা, আত্মতৃপ্তি আর বৌদ্ধিক অসততা □ জয় দুবাসী □ ২৮

জন্মেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ : অথঃ বুদ্ধিজীবী সেকিউলার ইত্যাদি অর্থ বর্ণন □ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী □ ৩০

গট-আপ গেম : ডিল কমপ্লিট □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ৩২

পরলোকে ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৩

দিল্লীর বর্তমান রাজনীতি এবং রাজ্য বিজেপি □ শ্যামল কুমার হাতি □ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ

বোধন : ২১ □ □ চিঠিপত্র : ২২-২৩ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৫ □ সু-স্বাস্থ্য : ৩৬ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭ □ □ খেলা : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মল্লভূম রাজবাড়ির দুর্গোৎসব
পৃঃ ১৪-১৯

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৮ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৫ অক্টোবর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ১২ নভে. ২০১২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ নভে. ২০১২

দীপাবলী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : ১৭৫তম জন্মবর্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। সমকালীন যুগে এবং ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ধারায় এক কিংবদন্তী চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত স্পর্শ যেমন সেই চরিত্রকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল, তেমনি রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে কেশব সেনের অপরিসীম ভূমিকাও অবশ্যই স্বীকার্য। মনীষী মূল্যায়নের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র পূত সম্পর্কের আলোকপাতও থাকছে ব্রহ্মানন্দের ১৭৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত নিবন্ধে। লিখেছেন— প্রীতিমাধব রায়, অর্ণব নাগ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

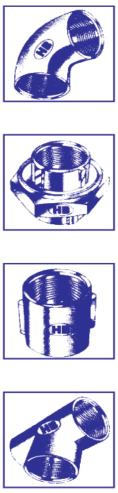

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

২-জি, কমনওয়েলথ-এর পর এখন জামাই কেলেঙ্কারি

দুর্নীতি একটি মহাসংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি আজ কংগ্রেস দলটিকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়াছে। দলটিকে গ্রাস করিবার পর কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাইকেও গ্রাস করিতে পারিয়াছে। উল্লেখ্য, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢ়রার বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তিজনিত দুর্নীতির অভিযোগ আনিয়া দেশ জুড়িয়া শোরগোল ফেলিয়া দিয়াছেন আন্না হাজারের দুই সহযোগী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও প্রশান্তভূষণ। কেজরিওয়াল জোর গলায় যখন বলিতেছেন, রবার্ট যদি তাহার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মানহানির মামলার মুখোমুখি হইতেও রাজি। তখন রবার্টের সাহসে কুলাইতেছে না ইহার প্রতিবাদ করিবার। অবশ্য মাঝখান হইতে কংগ্রেস দল 'রবার্ট নির্দোষ' বলিয়া ঢোল বাজাইতেছে। রবার্ট বঢ়রা কংগ্রেস দলের সদস্য নন, তিনি একজন সাধারণ শিল্পপতি। তাহা হইলে 'রবার্ট নির্দোষ' বলিয়া কংগ্রেসের ঢোল বাজাইবার কারণ কি? রহস্য এইখানেই। সোনিয়ার জামাতা বাবাজীবন অবৈধভাবে ৫০ লাখ টাকায় ৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। আবাসন ব্যারন ডি এল এফের নিকট হইতে বিনাসুদে ৬৫ কোটি ঋণও বাগাইয়াছেন। ডি এল এফের নিকট হইতে পাওয়া টাকা হইতে রবার্ট মাত্র পাঁচ কোটি টাকার বিনিময়ে ওই কোম্পানিরই সাতটি ফ্ল্যাট ক্রয় করিয়াছিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্বেও রবার্টের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। অথচ বর্তমানে তিনি ৩০০ কোটি টাকার মালিক। এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে রবার্ট ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হইলেন তাহা রহস্যজনক। অভিযোগ, রবার্টের এই সমস্ত সুবিধা দিবার বিনিময়ে ডি এল এফ দিল্লিসহ কংগ্রেস শাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যে নিজেদের পছন্দমতো স্থানে জমি পাইয়াছে। আন্না হাজারে, বাবা রামদেবসহ সমস্ত বিরোধী দল রবার্টের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাইয়াছেন। রবার্ট নয়, কংগ্রেস দল সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। কোনকালে চোর স্বয়ং অভিযোগ সত্য বলিয়া জেলে গিয়াছে? চোরের মায়ের গলাই চিরকাল বড় হইয়া থাকে। ২-জি কেলেঙ্কারি লইয়া কংগ্রেস দল সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়াছিল, কয়লা কেলেঙ্কারি লইয়াও একই কথা বলিয়াছিল। অথচ এইসব নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগে বর্তমান মন্ত্রিসভার ১৫ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়িয়াছে, দুইজন মন্ত্রী জেলের ঘানি টানিয়াছেন। কংগ্রেসের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া ঢোল বাজাইবার শব্দেই সকলে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে— চোরেদের জামাই চোরই হইয়া থাকে। কারণ রতনে রতনকেই পছন্দ করিয়া থাকে। ইহার পূর্বে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্থাপিত অভিযোগ সোনিয়ার চিকিৎসা বাবদ ১৮৮০ কোটি টাকা কে খরচ করিয়াছে, তাহারও সঠিক কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। কেবল অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়াই দায় সারা হইয়াছে। বিজেপি মুখপাত্র মুক্তার আব্বাস নাকভি এইজন্যই বলিয়াছেন— 'ইউ পি এ চেয়ারপার্সনের বাড়িটাই হইয়া গিয়াছে রিয়েল এস্টেট চুক্তির জায়গা।' বস্তুত কংগ্রেসর দুর্নীতি এখন স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রবিশঙ্কর প্রসাদ একারণেই বলেছেন— '২-জি কেলেঙ্কারি হইয়াছিল আকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে, কমনওয়েলথ গেম কেলেঙ্কারি হইয়াছিল মাটিতে আর কয়লা কেলেঙ্কারি ঘটিয়াছে পাতালে এবং এখন দেশ জুড়িয়া চলিতেছে নানা দুর্নীতি। রবার্ট বঢ়রা এই কেলেঙ্কারির আরও একজন নায়ক।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

''কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন— যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপ তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mall of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)। এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোর একজন কি দু'জন দেশের লোকশিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে— তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে যে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?”

—স্বামী বিবেকানন্দ

সংবাদ প্রতিবেদন

রামমন্দির তৈরির জন্য সংসদ আইন করুক : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামমন্দির নির্মাণের জন্য সংসদ আইন পাশ করুক। যদিও বিষয়টি এখনও আদালতের বিচার্য, তবুও আবেদন করছি, মুসলিম ভাইয়েরা তাদের মতপার্থক্য ভুলে জাতীয় সংহতির স্বার্থে এগিয়ে আসুক। ২০১০ সালে সেপ্টেম্বরে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত একথা বলেন।

রাঁচীতে আলোচনাচক্রে অন্যদের সঙ্গে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

গত ৪ অক্টোবর রাঁচিতে 'আর এস এসের ভূমিকা ও দায়িত্ব' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, রামমন্দির নির্মাণ মর্যাদা-অমর্যাদার বিষয় নয়। দুটি গোষ্ঠীর কিছু দুরভিসন্ধি- পরায়ণ শক্তি নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাধা সৃষ্টি করছে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ জাতীয় গর্বের বিষয় এবং বহুত্ববাদী সমাজে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের স্বীকৃতি। এই বিষয়ে সংসদের একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির তাদের সাংসদদেরকে এই বিষয়ে সমর্থন করতে বলা উচিত। কয়েকটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল যারা আর এস এস-কে ধ্বংস করতে চায় তারাই শুধু আর এস এসকে মুসলিম-বিদ্বেষী বলে প্রচার করে থাকে।

নাগপুরের মুসলিমদের আর এস এস-কে নিয়ে এরকম কোনও সন্দেহ নেই। কেননা তারা প্রতিদিনই আমাদের দেখছে। তারা আসে, সঙ্ঘে যোগ দেয় এবং একসঙ্গে থাকে। মুসলিমরা যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ষড়যন্ত্রের শিকার তা তাদের বুঝতে হবে বলে তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, সারা দেশে এখন ৬০ হাজার স্থানে শাখা চলছে। প্রচারকদের সংখ্যা কমছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হলে তিনি বলেন, প্রচারক খুব কঠিন কাজ। এখন সারা দেশে ২৩০০ জন প্রচারক আছেন।

মুসলিমদের আক্রমণে বৌদ্ধ মন্দির ও ঘরবাড়ি ভস্মীভূত বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি বাংলাদেশে আবার একবার ঘৃণার হিংস্র বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। শনিবার রাতের অন্ধকারে বাসভর্তি হয়ে ইসলামপন্থী এইসব দুষ্কৃতীরা কক্সবাজারে পৌঁছায়। সেখানে উত্তেজক বক্তৃতা স্লোগান ইত্যাদি দিয়ে আক্রমণকারীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। দক্ষিণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উপকূলের এই জেলায় দুষ্কৃতীরা কমপক্ষে ১০টি বৌদ্ধ মন্দির ও ৪০টি বৌদ্ধদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। কয়েকটি মন্দির তো আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখানকার প্রধান প্যাগোডা সীমা বৌদ্ধ বিহার-এর বলতে গেলে আর কিছুই

মুসলিম আক্রমণের চিহ্ন।

অবশিষ্ট নেই। প্রায় ২০০০ দুষ্কৃতীদের একটি দল লোহার রড, কুঠার, আগুন জ্বালানোর উপকরণ নিয়ে নিরীহ বৌদ্ধদের আক্রমণ করে। পুরো ঘটনাটাই যে ইসলামপন্থীদের পূর্ব পরিকল্পিত বাংলাদেশ সরকারও তা স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দিন খান আলমগীর রোহিঙ্গা মুসলিমদের দিকে আঙুল তুলেছেন। প্রতিবেশী দেশ মায়নমারে বৌদ্ধদের সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সংঘর্ষ চলছে। কক্সবাজারে আক্রমণ তারই প্রতিক্রিয়া। কক্সবাজারে বৌদ্ধদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলেও মুসলিমদের ঘরবাড়িগুলি কিন্তু অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় মুসলিমরাও যে বহিরাগত আক্রমণ-কারীদের মদত দিয়েছিল এতেই তা স্পষ্ট।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত রাহুল সিন্‌হা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৭ অক্টোবর রাজ্য-বিজেপির সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হলেন রাহুল সিনহা। একই ব্যক্তির পরপর দু'বার সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি দলীয় নীতি পরিবর্তন হবার সুবাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওই পদে জয়ী হন রাহুলবাবু। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসার হরেন্দ্রপ্রতাপ পান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর তরফে এ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংসদ চন্দন মিত্র। রাহুলবাবু আপাতত পঞ্চায়েত নির্বাচনকেই তাঁদের পাখির চোখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘এ রাজ্যের মানুষ তৃণমূল-কংগ্রেস-সিপিএম তিনটি দলকেই পরখ করে দেখে নিয়েছেন। তাঁরা হতাশ। তাই এখন মানুষ বিজেপি-র দিকেই ঝুঁকছেন।’’ পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল আশাতীত ভাল ফল করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জনমত সমীক্ষা

বিজেপি-র দখলেই গুজরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৩৩টি আসন পেতে পারে। সম্প্রতি লেন্স অন নিউজ-এর এক সমীক্ষায় এটা জানা গেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস পেতে পারে মাত্র ৪৩টি আসন। গত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৫৯টি আসন। বিজেপি-র ভোটের হারও বাড়তে পারে। গুজরাটে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ।

গত ২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেন্স অন নিউজ গোটা গুজরাট জুড়ে ৫২টি কেন্দ্রের ৭২৯৪ ভোটারের মতামত গ্রহণ করে। তাতেই এই ফলাফল উঠে এসেছে।

রেগা প্রকল্পে এবার কবরস্থান ঘেরা হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এইবার ‘রেগা’-র টাকায় পঞ্চায়েত এলাকায় কবরস্থান, দরগা ও ইদগা-তে বেড়া দেওয়া (লাইভ ফেনস) হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সম্প্রতি এই প্রস্তাব দিয়েছেন। ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিস-এর প্রধান ওজাহাদ হবিবুল্লা (Wajahat Habibullah) এই মর্মে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে অনুরোধ করেছিলেন। তারই প্রত্যুত্তরে শ্রী রমেশ বলেছেন, রেগা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি অ্যাক্টের (এম এন আর জি এ) জমি উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ-এর আওতায় বিষয়টিকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছে বলে হবিবুল্লা জানিয়েছেন।

হবিবুল্লার অনুরোধে রমেশের এই প্রস্তাব তাৎপর্যপূর্ণ বলতে হবে। কেননা এই প্রস্তাব যদি কার্যকর হয় তবে এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় কোনও ধর্মীয় স্থান রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকেও কবরস্থান ঘিরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আগামী ২০.১০.২০১২, শনিবার থেকে ২৯.১০.২০১২, সোমবার অবধি স্বস্তিকা'র কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ৩০.১০.২০১২, মঙ্গলবার থেকে যথারীতি কার্যালয়ের কাজ শুরু হবে।

পূজাবকাশের জন্য আগামী ২৯.১০.২০১২ ও ০৫.১১.২০১২ তারিখের ‘স্বস্তিকা’ প্রকাশিত হবে না। ১২.১১.২০১২ তারিখের সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

— *ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

সংবাদ প্রতিবেদন

থোরিয়াম কি ইউপিএ-এর নতুন কোলগেট ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নানা দুর্নীতি নিয়ে সরকার ব্যতিব্যস্ত। সংসদ উত্তাল। কখনও ২জি স্পেকট্রাম, কখনওবা কোলগেট কেলেঙ্কারি। সারা দেশের মানুষ শাসক জোটের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের নানা কেলেঙ্কারিতে অতিষ্ঠ। আর ঠিক এই সময়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ভারত তার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মূল্যের প্রাকৃতিক সম্পদ হারাচ্ছে। তামিলনাড়ুর তিরুনেভেলির এক ব্যবসায়ী ভারতের খনিজ সম্পদ চুরি করে মহা বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের এই মূল্যবান খনিজ সম্পদ যা ভারতকে সুপারপাওয়ার হিসাবে তৈরি করতে সমর্থ তা নিয়েই ওই ব্যবসায়ীর চোরা ব্যবসা। শুধু তাই নয়, এই চোরা ব্যবসা ভারতকে তার শক্তির (এনার্জি) নিরাপত্তা ও কৌশলগত অবস্থানের সঙ্গে একটা আপোষ- মীমাংসার সন্ধান করতে বাধ্য করছে।

- ২.১ লক্ষ টন মোনাজাইট, ১৯৫৩০০ টন থোরিয়ামের সমান। ৯.৩ শতাংশ রিকভারি রেট। ভারতের সমুদ্র তীর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।
- বিশ্বের ৩০ শতাংশ থোরিয়াম ভারতে মজুত আছে। মানাভালাকুরিচিতে। তা ২জি স্পেকট্রামের ৭২০ গুণ মূল্যবান।
- থোরিয়াম পরমাণু সংক্রান্ত জ্বালানিতে ব্যবহার হয়। যা মিসাইলেও দরকার হয়।
- উড়িষ্যা স্যান্ড কমপ্লেক্স, মানাভালাকুরিচি, কন্যাকুমারী, আলুভা এবং ছাঙারা বেল্ট (কেরল) মোনাজাইট কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলার মানাভালাকুরিচি বরাবর সমুদ্রের তটভূমি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সমুদ্র সৈকতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোনাজাইট, ইলমেনাইট, গার্নেট, জিরকন এবং রিউটাইল-এর মতো খনিজ সম্পদ মজুত আছে। এইসব খনিজ সম্পদ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানাভালাকুরিচি মোনাজাইট-এ ১২ শতাংশ থোরিয়াম থাকে। ভারতের অগ্রণী সামুদ্রিক খনিজ বিশেষজ্ঞ প্রফেসার ভি. রাজামানিকম-এর মতে মানাভালাকুরিচিতে পৃথিবীর ৩০ শতাংশ থোরিয়াম পাওয়া যায়। ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লু এন এ)-এর মতে ৩,০০,০০০ টন থোরিয়াম ভারতে মজুত রয়েছে যা পরমাণু শিল্পের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাইরের পৃথিবীর কাছে একথা জানা নেই যে তিরুনেভেলির একজনমাত্র ব্যবসায়ী দক্ষিণ তামিলনাড়ুর খনিজ সম্পদ উত্তোলন করছে। ইন্ডিয়ান ব্যুরোর অনুমোদিত ১১১টি গার্নেট খনির মধ্যে ৯৬টির মালিক সে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ৪৪টি ইলমেনাইট খনির সবগুলিরই যে মালিক। মানাভালাকুরিচিতে পৃথিবীর যে ৩০ শতাংশ থোরিয়াম মজুত আছে তা ২জি স্পেকট্রামের চেয়ে অর্থমূল্যে ৭২০ গুণ বেশি। এই অনুমান বিশ্বের অগ্রণী ভূতাত্ত্বিকদের।

ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাইওনীয়ার' সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই কোম্পানিটি কোনও আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই একচেটিয়াভাবে থোরিয়াম সমৃদ্ধ বালি বাইরের দেশে পাঠাচ্ছে। মানাভালাকুরিচিতে বালিভর্তি কনটেনার তুতিকোরিন বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হয়। বড় জাহাজগুলো তিরুনেভেলী এবং কন্যাকুমারীতে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট ছোট জাহাজের মাধ্যমে এই সমস্ত দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ বালি তোলা হয় এবং এটা প্রায় রোজকারই ঘটনা। খনির মালিক ধনী হয়েছে ইলমেনাইট, রিউটাইল, গার্নেট, জিরকিন বিদেশে বেচে। ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি (ডি এ ই) সমুদ্রধারে বালির দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছে। কেননা এই বালিতে থাকছে থোরিয়াম, জিরিকন, ইলমেনাইট-এর মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদ। কিন্তু তবুও এই ঘটনা ঘটছে। ডি এ ই-র অফিসাররা ব্যাপারটা দেখভাল করেন যা শুধু ওখান থেকে রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু কনটেনার করে থোরিয়াম সমৃদ্ধ বালি রপ্তানি হচ্ছে, সেটার দিকে নজর নেই। এটমিক এনার্জি দপ্তর এই লুঠ তাদের চোখের সামনে হতে দেখছে। কেরলের অ্যালুভা-র ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটিডের দুজন অফিসার জানিয়েছেন তারা এই চুরি ঠেকাতে অসমর্থ। এই বালি সংগ্রহের লাইসেন্স ইস্যু করেছে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বড় কর্তারা। ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড এখন আর কোনও খনন কাজ চালায় না। লাইসেন্স একটি মাত্র শর্তে দেওয়া হয়েছিল যে থোরিয়াম ডি এ ই-কে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু খনি ব্যবসায়ী এক কণা থোরিয়ামও ডি এ ই-কে ফেরত দেয়নি। বরং আই আর ই এবং ডি এ ই এর ইঞ্জিনিয়াররা মোনাজাইট রপ্তানি করতেন। তাকে সাহায্য করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভাবা অ্যাটমিক গবেষণা কেন্দ্রের (বি এ আর সি)-র প্রাক্তন ডিরেক্টার ডঃ সি এস পি আইয়ার একটি মজার কথা বলেছেন। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সেন্টার তাকে ভারতীয় কোস্ট লাইনের সম্পদের উপর এক রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেয়। এবং তিনি একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। রিপোর্টটির নাম 'ক্যাপসিটি বিল্ডিং ফর কোস্টাল প্লেসার মাইনিং'। এই সূত্রে তিনি তামিলনাড়ুর ও কেরলের সমুদ্রতীর পর্যবেক্ষণে যান। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর স্থান তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তারা যেন কিছু লুকোতে চাইছেন। ভারত আমেরিকান সিভিল পরমাণু চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কোনও এক দেশের চাপে ভারত তার খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত আইন বদলায়। ভারতের এই খনিজ সম্পদ বিদেশে রপ্তানি হতে থাকে। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মোনাজাইট রপ্তানি করতে পারতো না কারণ তাতে থোরিয়াম রয়েছে। থোরিয়াম রপ্তানির হচ্ছে কিনা তা দেখভালের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। তিরুনেভেলীর সেই ব্যবসায়ী সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। এই অবৈধভাবে থোরিয়াম রপ্তানির কথা প্রথমে ডি এ ই বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন। কিন্তু তাদের হাত পা বাঁধা। তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জানান। তার মধ্যে রয়েছেন ভিঃ সুন্দরম যিনি তামিলনাড়ু সরকারের প্রাক্তন সচিব এবং এস কল্যাবমন যিনি এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর প্রাক্তন প্রধান। সুন্দরম তিরুনেভেলী জেলার একটি পুরাতন স্কুলে পড়তেন এবং পরে এই জেলার কালেক্টর ছিলেন। এই জেলাকে তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন। দেশের এই সম্পদকে বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাকে দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ জানান। জানিয়েছেন কল্যাণরমন যিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্ট সার্ভিস থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছে, এই অঞ্চলের থোরিয়ামের মোট বিনিময় মূল্য ১৩৪০ বিলিয়ন। এটা কনজারভেটিভ হিসাব মাত্র। যদি কৌশলগত অবস্থান বিবেচনা করা হয় তবে এর দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। থোরিয়ামের মাধ্যমেই ভারত সুপার পাওয়ার হতে পারে তাই এর কৌশলগত অবস্থানের মূল্য রয়েছে।

গূঢ়পুরুষের

কলম

কোনও বিনিয়োগ না করেই ৩০০ কোটি টাকা আয় রবার্ট বঢ়রার

সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ এনেছে, ‘ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপসন’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে অরবিন্দ কেজরিবাল ও প্রশান্ত ভূষণ। ওই সবই সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সকলেরই জানা। তবে আরও কয়েকটি কথা অরবিন্দবাবুরা বলতে পারতেন। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী না হয়েও রবার্ট বঢরাকে দেশের সব বিমান বন্দরে বিনা সিকিউরিটি চেকে বিমানে উঠতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। দেশের বিমান বন্দরে সিকিউরিটি চেক করা হয় না রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, সেনাবাহিনীর তিন প্রধান সব মোট ৩২ জন ভি ভি আই পি-র। এই তালিকায় মাত্র ২ জন আছেন যাঁরা রাষ্ট্রের সম্মানীয় উচ্চপদে আসীন নন। অতীতেও ছিলেন না। এই দুই ব্যক্তি হলেন, বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা এবং সোনিয়ার জামাতা রবার্ট বঢরা। চীন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তিব্বত দখল করলে, ভারত দলাই লামাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। তাই বিদেশী অতিথিকে সৌজন্য দেখিয়ে ভি ভি আই পি-র তালিকায় রাখা হয়েছে। কিন্তু রবার্ট বঢরাকে দলাই লামার সম আসনে বসিয়ে ভি ভি আই পি তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণটা কী বোঝা গেল না। এখানেই শেষ নয়। সরকারি খরচে বঢরাকে ২৪ ঘণ্টা স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপের নিরাপত্তা বলয়ে রাখা হয়। ইনি এমন একজন মহাত্মা ব্যবসায়ী যিনি মাত্র ৮ বছরে ৩০০ কোটি টাকা আয় করেছেন কোনও মূলধন বিনিয়োগ না করেই। তাই রবার্ট বঢরাকে শুধুই ব্যবসায়ী না বলে তাঁকে বিশ্বের সেরা জাদুকরও বলা উচিত। স্রেফ হাওয়া থেকে হাত ঘুরিয়ে কোটি কোটি টাকার বৃষ্টি আনা যায় এমন ভেলকি বিশ্বের কোনও জাদুকর জানেন?

এই ভেলকি দেখানোর গোপন রহস্যটি একদা ডঃ সুব্রমনিয়াম স্বামী ফাঁস করেছিলেন। তিনি রীতিমত সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, বিগত ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বোস্টনের লোগান বিমান বন্দরে সোনিয়া পুত্র রাহুল গান্ধীকে সেখানের নিরাপত্তাকর্মীরা আটক করে। রাহুলের বাক্স থেকে ১৬০,০০০ মার্কিন ডলার পাওয়া যায়। আমেরিকার আইনে ১০ হাজার ডলারের বেশি সঙ্গে থাকলে তা লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হয়। ঘোষণা না

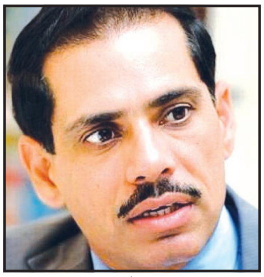

রবার্ট বঢ়রা

করলে দীর্ঘকালের জন্য কারাবাসে যেতে হয়। বোস্টনের বিমান বন্দরে ধরা পড়ার পর কাস্টমস্ অফিসারদের কাছে রাহুল যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে স্বীকার করেন যে সুইট্জারল্যান্ডের জুরিখের একটি ব্যাঙ্ক থেকে তিনি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছেন। এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন কেন্দ্রে বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় ছিল। রাহুল তাঁর ধরা পড়ার খবর টেলিফোনে দিল্লীতে তাঁর মা সোনিয়াকে জানান। উদ্বিগ্ন সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে ফোন করে পুত্রকে রক্ষা করার আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি ব্রজেশ মিশ্র কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমেরিকার বিদেশ সচিবের মাধ্যমে রাহুলকে মুক্ত করে লন্ডনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। কোনও অজ্ঞাতকারণে বিজেপি রাহুলের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়। কিন্তু রাহুলের গোপন টাকা লেনদেন করার অদক্ষতায় বিরক্ত সোনিয়া এরপরেই গান্ধী পরিবারের আর্থিক দিকটি দেখার দায়িত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য জামাই রবার্টকে। এর পরেই এক দশকের মধ্যেই রবার্ট বঢরা বিপুল বিত্তশালী ব্যবসায়ী বনে যান। কিন্তু তিনি ব্যবসাটা ঠিক কী করেন কেউ জানে না। টাটাদের বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়তে সময় লেগেছিল ১০০ বছর। আম্বানিদের ৫০ বছর। বঢরার দশ বছরের কম সময়। তাই রবার্ট বঢরাকে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বানাবার জাদুকর বলা উচিত।

রবার্ট বঢরার জীবনও বিচিত্র। তাঁর মা মৌরিন স্কটল্যান্ডের নাগরিক। বাবা রাজেন্দ্র বঢরার বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। পিতলের তৈরি মূর্তির ও অন্যান্য হস্তশিল্পের ব্যবসা করতেন। দেশভাগের পর পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে তাঁদের পরিবার মোরাদাবাদে চলে আসেন। রাজেন্দ্র বঢরার দুই পুত্র ও এক কন্যা। রবার্ট, রিচার্ড এবং মিশেল। ১৯৯৭ সালে রবার্টের সঙ্গে প্রণয় ও বিবাহ হয় সোনিয়া তনয়া প্রিয়াঙ্কার। সমাজের যে উচ্চস্তরে গান্ধী পরিবারের বাস তার ধারেকাছে বঢরা পরিবার পৌঁছতে পারে না। এমন একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক মর্যাদাহানিকর। সোনিয়ার নির্দেশে রবার্ট বঢরা তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। প্রকাশ্যে রবার্ট বলে তাঁর শ্বশুরবাড়ির নাম ভাঙিয়ে তাঁর বাবা এবং ভাই প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদেছে। প্রতিবাদে রবার্টের বাবা রাজেন্দ্র, ভাই রিচার্ড এবং বোন মিশেল মানহানির মামলা করার হুমকি দেন। সালটা ছিল ২০০১। সেই বছরেই এক রহস্যজনক মোটর দুর্ঘটনায় মিশেল মারা যায়। এরপর ২০০৩ সালে রবার্টের ভাই রিচার্ড খুন হন। পুলিশ অবশ্য এটিকে নিছক একটি আত্মহত্যা বলে লিপিবদ্ধ করে। রবার্ট বঢরার বাবা রহস্যজনকভাবে মারা যান ২০০৯ সালে। পুলিশ জানায় রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ট অ্যাটাকে রাজেন্দ্র বঢরা মারা গেছেন। শুধু প্রাণে বেঁচে আছেন রবার্টের শ্বেতাঙ্গিনী মা মৌরীন। এখন তাঁর নামেই রবার্ট বঢরা পাঁচটি ভুয়া কোম্পানী চালাচ্ছেন। কাগজে কলমে মৌরীন ম্যাকডোনা বঢরা তার মালকিন। হয়তো এই কারণে বা প্রয়োজনে তিনি আজও বেঁচে আছেন।

নানা সংকটে জর্জরিত রাজ্য

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতি

এ রাজ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানান দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই রাজ্যের শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূলী সরকারের অবস্থান দেখা যাক। সরকারের প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী এখন ইউপিএ-২ অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘সংস্কারের নামে লুঠ চলেছে! মনমোহন হঠাও দেশ বাঁচাও!’’ মমতাপন্থী সংবাদপত্র- সাংবাদিকদের লেখায় যে মনোভাব ফুটে উঠেছে তা হলো প্রধানমন্ত্রী পদে মমতাকে ‘সবাই’ চাইছে।’’

এই সব লেখার মাধ্যমে মমতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। মমতা সেই কারণেই বলেছেন আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে তিনি একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে চান এবং সেই ফ্রন্টের চালিকাশক্তি তিনি হবেন। এ সম্পর্কে সিপিআই-সিপিএমের প্রতিক্রিয়া তীব্র।

সিপিআই-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেছেন, ‘মমতা বামপন্থী নন। তিনি বামপন্থী বুলি আওড়াচ্ছেন মাত্র। কেননা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন।’ সিপিএমের মতে বামপন্থী স্লোগান দিয়ে হিটলার মুসোলিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু রাজ্য-চালাতে যিনি ব্যর্থ তিনি কোন সাহসে প্রধানমন্ত্রী হতে চান?

এদিকে এ রাজ্যে যে সমস্যাগুলি সামনে এসেছে তা হলো ত্রিফলা আলোতে অযথা অর্থব্যয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের ঘর সাজানো হচ্ছে। এরপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো সরকারিভাবে নির্দেশ জারি করে প্রাক্তন তৃণমূলী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক একটি দপ্তরের উপদেষ্টা করা হয়েছে। এটা বোধহয় এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সান্ত্বনা পুরস্কার। এদিকে যখন রাজকোষের অর্থ বিপুলভাবে অযথা ব্যয় হচ্ছে অপরদিকে তখন ২৫ হাজার পরিবহণ কর্মীর বেতন-বোনাস দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, রাজনৈতিক পেনসনার্সদের এক্সগ্রাসিয়া মঞ্জুর করে, প্রত্যাহার করা হয়েছে। এঁদের আর্থিকভাতা বন্ধ করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন মমতার পোষ্য সাংবাদিকগণ। এক বিরাট সংকটজনক সমস্যায় ডুবে আছে হলদিয়া বন্দর। এ সমস্যা মেটানোর জন্য দফায় দফায় আলোচনা করছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। সবথেকে চমকপ্রদ ঘটনা হলো এই আলোচনার শেষ দিনে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত পরাজিত সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের অংশগ্রহণ। শোনা যাচ্ছে মিডিয়েটরদের কয়েকজন নাকি লক্ষ্মণ শেঠকে আলোচনায় যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও জানা গেল লক্ষ্মণকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করে আনবার জন্য কিছু শিল্পপতি আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টে জেঠমালানিকে নাকি লক্ষ্মণ শেঠের মামলার দায়িত্ব দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, লক্ষ্মণের আমলে টাকা গেলেও কাজ পাওয়া যেত। লক্ষ্মণবাবু হলদিয়া বন্দরের জট কাটাবার জন্য কিছু প্রস্তাব আলোচনা সভায় পেশ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রস্তাবকে বাস্তব বলে অনেকে মনে করছেন। কিছু মিডিয়েটর মনে করতে আরম্ভ করেছেন— ‘তৃণমূল সরকার বন্দর সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ।’ উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ, ইউপিএ-২ সরকারের উৎখাতে তৃণমূল দল মেতে উঠেছে। এতে হলদিয়ার বন্দর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিস্পৃহ করে তুলছে!

এ রাজ্যে আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে— এ সমস্যা তৈরিতে সিপিএম এবং তৃণমূলনেত্রীর কি কোনও ‘অর্থদান’ নেই? তা হলো মুসলিমদের পৃথক সমাবেশ এবং পৃথক দাবি দাওয়ার স্লোগান তোলা হচ্ছে। এ রাজ্যের মুসলিমগণ নিজেদের পৃথক সত্তা ঘোষণা করছে— তাঁরা যেন পশ্চিমবঙ্গবাসী নন। এ এক অশুভ সূচনা।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়— ১৯৪৬-এ মুসলিম লিগের স্বতন্ত্র সমাবেশ ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশান’ ’১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ এক সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য দরকার। শুধু মুসলিম নয়— পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বহু দাবি-দাওয়া আছে। তার সমাধানে ব্যর্থ তৃণমূলী সরকার।

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

স্বপ্নের পোলাওয়ে ইচ্ছে মতো ঘি!

মাননীয় পাঠকবৃন্দ,

পুজোর আগে আমি কেমন দিশেহারা। কাকে যে চিঠি লিখব ভেবে পাচ্ছি না। দু'দিকে দু'জন যে খেলা দেখাচ্ছেন তাতে আমার মতো মনে হয় আপনারাও দিশেহারা।

এক নম্বরে দেশের প্রধানমন্ত্রী। সংস্কারে মেতেছেন তিনি। অপরদিকে সংস্কারের ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দু'জনকে দু'টো চিঠি লেখার চেয়ে আপনারাই ভাল।

মার্কিন সরকার এবং পত্র-পত্রিকার নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেশে সংস্কার সংস্কার রব তুলেছেন মনমোহন সিং। জনগণের নাভিশ্বাস তোলা সেই সংস্কারের বহর দেখে তাজ্জব হতেই হবে। সাধারণ মানুষ অবশ্য তাজ্জব হওয়ার বদলে হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। আর তার সংস্কার হাড়ে হাড়ে টের পাবে কংগ্রেস। বছরের শেষে অগ্নিপরীক্ষার মুখে কংগ্রেসও। কারণ, গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনের রায় বুঝিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নীতিতে জনগণের রায় কী। ইঙ্গিত পাওয়া যাবে কী হতে চলেছে পরের লোকসভা নির্বাচনে। তবে মনমোহন সিং নাকি স্বপ্ন দেখছেন আবার ফিরবেন তিনি। জনগণ বুঝবে।

নির্বাচনের ময়দানে ২০১২ সালটা মোটেই সুখের নয় কংগ্রেসের কাছে। বছরের প্রথম ভাগে পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমি হারাচ্ছে কংগ্রেস। বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে চূড়ান্ত খারাপ ফল হয়েছে। ৪০৩ আসনের রাজ্যে কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে গেছে মাত্র ৩৭টা আসন। গান্ধী পরিবারের আসনগুলিও দখলে আনতে পারেনি রাহুল ব্রিগেড। হাতছাড়া হয়েছে গোয়া। উত্তরাখণ্ডে একটি আসনের জন্য ক্ষমতার দখল নিতে পারলেও পাঞ্জাব খুশি করতে পারেনি। তুলনায় ভাল ফল শুধু মণিপুরে। সেসময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল দুর্নীতি। নানা কেলেঙ্কারির পাশাপাশি লোকপাল বিল ও কালো টাকা ইস্যুতে বাবা রামদেব কিংবা আন্না হাজারেদের আন্দোলনেরও প্রভাব ছিল। এখন সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নীতির লড়াই। এফ ডি আই, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কিংবা রান্নার গ্যাস থেকে ভর্তুকি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। এর ওপর মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত সোনিয়া গান্ধী, মনমোহন সিং-রা। এরই মধ্যে গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। দুটি রাজ্যেই ক্ষমতার হিসেবে বিজেপি-র তুলনায় দুর্বল কংগ্রেস। দুই রাজ্যেই নরেন্দ্র মোদি, প্রেমকুমার ধুমলের নেতৃত্বে ক্ষমতায় বিজেপি। একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে ২০০৭ সালে কেমন ছিল গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনী ফল।

গুজরাট মোট আসন ১৮২

বিজেপি---দখলে ১১৭ আসন---প্রাপ্য ভোটের শতাংশ ৪৯.১২

কংগ্রেস—দখলে ৫৯ আসন—প্রাপ্য ভোটের শতাংশ ৩৮

হিমাচলপ্রদেশ মোট আসন ৬৮

বিজেপি—দখলে ৪১ আসন—প্রাপ্য ভোটের শতাংশ ৪৩.৭৮

কংগ্রেস—দখলে ২৩ আসন—প্রাপ্য ভোটের শতাংশ ৩৮.৯

বছরের গোড়ায় পাঁচ রাজ্যের যে ফল হয়েছে তাতে গুজরাট বা হিমাচলপ্রদেশ দখল করা নিয়ে কংগ্রেস শিবিরও খুব একটা আশাবাদী নয়। তবে এবার কংগ্রেসের পাশাপাশি অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে মনমোহন সিংয়ের সংস্কার নীতি। একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি যে, দুই রাজ্যের ফলে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে সংস্কার প্রসঙ্গে মনমোহন সরকারের ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা।

ওদিকে স্বপ্নের পোলাওয়ে ইচ্ছে মতো ঘি ঢালতে লেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লীতে স্লোগান উঠল দেশ কি নেতা কেয়সি হো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় য্যায়সি হো। স্লোগান তুললেন কে? দিদির অনুগত ভাই সৌগত রায়। আর যন্তরমন্তরের সেই সমাবেশ থেকেই দেশ জোড়া আন্দোলনের ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার জননেত্রী এবার দেশনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। শপথ গ্রহণের জন্য কোনও একটা শুক্রবার বেছেও রেখেছেন হয়তো। উনি তো আবার শুক্রবার ছাড়া শুভ কাজ করেন না।

সব শেষে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি শোনা গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। বলেছেন, সংসদে অনস্থা প্রস্তাব আনতেও পিছপা হবে না তাঁর দল। একই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক মহলের কাছে তাঁর আর্জি সমর্থন কিনে যেন টিকতে না পারে সরকার। ভাবা যায় এই সরকারটার সঙ্গেই এতকাল ঝোলে-ঝালে-অম্বলে তিনি ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে সরকার তো ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু লালবাতিতে অভ্যস্ত ভাইরা তো বেকার হয়ে গেছেন। হাতে কাজ নেই। মিডিয়ার আলো নেই। চোখের জল দেখে দিদি অবশ্য কদিনের মধ্যেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছেন। মন্ত্রী থাকা সাত ভাই এমনকি অবাধ্য দীনেশ ত্রিবেদীও এখন থেকে দিদির সপ্তরত্ন সভায় থাকছেন। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে মহাকরণেই তাঁরা আলো করে বসবেন। আলাদা ঘর, আলাদা টয়লেট, গাড়ি, সচিব সব ব্যবস্থা পাকা।

এর আগে চিঠিতে লিখেছিলাম লোকসভা নির্বাচনের আগে দিদির দলের এফ ডি আই নীতি কী ছিল। এবার জানিয়ে রাখি, সেসময় তাঁরা বা তিনি বলতেন, রাজ্য সরকারের চাপানো করের জন্য রান্নার গ্যাসের দাম বেশি। কিন্তু এখন তিনি সেটা কমাতে রাজি।

দিদি প্রাক্তন মন্ত্রী ভাইদের কান্নায় সারা দিয়েছেন। আশা করি আমাদের কান্নাও শুনবেন। আসুন আমরা সবাই মিলে কাঁদি, ও দিদি, তুমি তো জনদরদী। দাও না গো কর কমিয়ে। একটু; বোঝা কমাও না গো লক্ষ্মী দিদিমণি।

— **সুন্দর মৌলিক**

অপরাধপ্রবণ জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে দেশ শাসন কি সম্ভব?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদ ও বিধানসভাগুলোর যে নির্বাচিত সদস্যরা ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের ৩১ শতাংশের বিরুদ্ধেই নাকি বিভিন্ন ধরণের মামলা ঝুলে আছে। সাংসদ ও বিধায়কদের প্রার্থী হওয়ার সময় নিজেদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানাতে হয়। সেখান থেকেই নাকি 'অ্যাসেসিয়েশান অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্' নামক একটা সংস্থা এই তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এবার পূর্বোক্ত নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন ৪৮৩৫ জন সাংসদ ও বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে ১৪৪৮ জনের বিরুদ্ধেই গুরুতর অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা রয়েছে।

সংখ্যাটা অবশ্যই ভয়াবহ। আর মামলাগুলো বেশ গুরুতর ধরনের। এর মধ্যে খুন, খুনের চেষ্টা, ডাকাতি, অপহরণ প্রভৃতি সাংঘাতিক অভিযোগও আছে।

আমরা অবশ্য কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলেই তাঁকে অপরাধী বলি না। আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না— দোষী বলার অধিকার প্রাথমিকভাবে শুধু মাননীয় বিচারকদেরই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা থাকবে কেন? আর সেটা দু-একজনের বিরুদ্ধে উঠলেও উঠতে পারে, কিন্তু ১৪৪৮ জন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এই ধরণের মামলা থাকাটা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয় কি? আগেই বলেছি— মামলাগুলো বিভিন্ন রকমের। তবে ৬৪১টা জঘন্য ধরনের। এর মধ্যে ৬ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে ধর্ষণের অভিযোগ। খুন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে যথাক্রমে ১৪১ ও ৩৫২ জনের বিরুদ্ধে। আর ১০ জনের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ৭৫ জনের বিরুদ্ধে আছে ডাকাতির অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন ৪২ জন সাংসদ ও ২৯৪ জন বিধায়ক। অদ্ভুত ব্যাপার হলো— তাঁদের মধ্যে ৩৫ শতাংশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে— এটা জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি। তবে সংখ্যার বিচারে বেশি অপরাধপ্রবণ উত্তরপ্রদেশ— মামলার সংখ্যা ওই রাজ্যের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই বেশি। আর ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ রয়েছে ঝাড়খণ্ডের এক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে— সংখ্যাটা ৩৫। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ওড়িশার এক এম পি।

> আমরা ধরে নিয়েছিলাম— জনসাধারণের প্রতিনিধিরা হবেন নিষ্কলঙ্ক মানুষ— জ্ঞানে, গুণে, সেবায়, মমতায়, কর্তব্যবোধে তাঁরা হবেন আদর্শস্থানীয়। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে জঘন্য ধরনের অভিযোগ থাকবে, বা অভিযুক্তের সংখ্যা এত বেশি হবে— এটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। অভিযোগ প্রকাশের কথা পরে— এই ধরনের অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আসে কেমন করে? সেই সুযোগ তাঁরা রেখেছেন নিশ্চয়।

আমরা ধরে নিয়েছিলাম--- জনসাধারণের প্রতিনিধিরা হবেন নিষ্কলঙ্ক মানুষ— জ্ঞানে, গুণে, সেবায়, মমতায়, কর্তব্যবোধে তাঁরা হবেন আদর্শস্থানীয়। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে জঘন্য ধরনের অভিযোগ থাকবে, বা অভিযুক্তের সংখ্যা এত বেশি হবে— এটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। অভিযোগ প্রকাশের কথা পরে— এই ধরনের অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আসে কেমন করে? সেই সুযোগ তাঁরা রেখেছেন নিশ্চয়।

প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ চাইতেন, জনপ্রতিনিধিরা নিরন্তর জ্ঞানচর্চার মধ্যে থাকবেন— সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রাত্যহিক ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হয়ে উঠবেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, তবেই তাঁরা দেশবাসীকে পথনির্দেশ করতে পারবেন।

কিন্তু অপরাধপ্রবণ জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে কি সেটা সম্ভব? হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর 'এ গ্রামার অফ পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন, নাগরিকত্বের সঙ্গে যুক্ত পরিশীলিত বিদ্যাচর্চা ('instructed judgement')। সেক্ষেত্রে

জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে লাগবে আরও বেশি জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চা। আমরাও মনে করি— গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের জন্য একান্ত দরকার প্রতিনিধিদের গুণগত উৎকর্ষ। কিন্তু অপরাধপ্রবণ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সেটা কি হতে পারে?

আমাদের সংবিধান সাংসদ ও বিধায়কদের ন্যূনতম বয়সের কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু শিক্ষাগত, গুণগত বা চারিত্রিক মান নিয়ে কিছু লেখেনি। এই কারণে অযোগ্য ব্যক্তিও প্রতিনিধি হয়ে যান। তাঁরা অন্যকে 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট' দেন, কিন্তু তাঁদের অনেকের পেছনেই থাকে অপরাধের অভিযোগ ও শিক্ষাগত অযোগ্যতার ছাপ। ড. এ সি কাপুর লিখেছেন, এঁদের কেউ কেউ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ডাকাতাদেরও কাজে লাগান। ('দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম')। অনেক ডাকাত-চোরও নির্বাচনে প্রার্থী হয়। কেউ কেউ জয়ীও হয় তাতে।

ডঃ বি সি রাউত জানিয়েছেন, অনেক জনপ্রতিনিধি সভাকক্ষের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না— উচ্চাঙ্গের বিতর্কের বদলে সেখানে শোনা যায় হৈ-হট্টগোল, দেখা যায় দক্ষযজ্ঞ ('ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া')। বিতর্কের মান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেক স্পিকারও। এস এল সিক্রি তাঁর 'ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— আলোচনার মান কোনও কোনও সময়ে ছোটদের স্কুলের বিতর্কসভার কার্যকলাপের পর্যায়ে নেমে আসে। শুরু হয় গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা।

সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। বৃটেনের লর্ডসভার সবাই মনোনীত। সেই কারণে সেখানে বহু জ্ঞানীগুণী মানুষকে পাওয়া যায়। ল্যাস্কি উচ্চকক্ষ থাকাটা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তিনিও লর্ডসভার আলোচনার মান নিয়ে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমরা এই সব ব্যাপার নিয়ে ভাবিনি। জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে গুণগত পরিবর্তন আনতেই হবে। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ লিখেছেন, ছোট মানুষদের নিয়ে বড় কিছু হয় না।

কথাটা সর্বাংশে সত্যি।

বড় কিছু করতে গেলে দরকার বড় মানুষদের। একটা আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থাও তৈরি করার জন্য প্রয়োজন মহৎ ও সৎ মানুষদের।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আর জি গেটেলের মতে, গণতন্ত্রের মূল কথা হলো গরিষ্ঠের শাসন বা 'rule of the majority' প্রতিষ্ঠিত করা (পলিটিক্যাল সায়েন্স, পৃ: ১৭৭)। কিন্তু তাতে গরিষ্ঠের তো বটেই--- সংখ্যাগরিষ্ঠেরও মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হওয়ার কথা। অথচ যদি নেতৃত্বের সঙ্কট ঘটে, তাহলে সেই বহুর শাসন প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় বাক্যবাগীশের শাসনে পরিণত হয়।

সেই কারণে বি আর গোখেল মনে করেন, সর্বাগ্রে দরকার 'good leadership'— (পলিটিক্যাল সায়েন্স পৃঃ ৬১০)। সৎ, নির্লোভ ও সেবক নেতারাই একটি দেশকে স্বর্গরাজ্যে উন্নীত করতে পারেন। তা না হলে দেখা দেয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা।

গণতান্ত্রিক জীবনের সাফল্যের জন্য দরকার অনেকগুলো শর্ত পূরণ। তার মধ্যে প্রধান হলো ব্যক্তি ও শাসকদের 'high moral standard'--- (আর জি আগরওয়াল— পলিটিক্যাল থিয়োরি, পৃঃ ২৭০)। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের জনসাধারণের তুলনায় আমাদের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তার অভাব দেখা দিয়েছে। এটাই বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ।

অ্যারিস্টট্ল্ কিন্তু গণতন্ত্র বা ডেমোক্র্যাসিকে একটি কাম্য ব্যবস্থা বলেননি। তাঁর মতে, বহুর শাসন কল্যাণমূলক হলে সেটা 'পলিটি'— তার বিকৃত রূপই হলো 'ডেমোক্র্যাসি'। তিনি মনে করতেন, স্বার্থপর ও স্বল্পশিক্ষিত নেতাদের মাধ্যমেই পলিটি ডেমেক্র্যাসিতে পরিণত হয়। এই জন্যই দরকার নেতৃত্বের উৎকর্ষ (ভাণ্ডারী শেঠী— স্টাডিজ ইন্ প্লেটো অ্যানড অ্যারিস্টটল)।

বৃটেনের লর্ডসভায় লর্ড ব্রাইজ, লর্ড কেইন্স, লর্ড সিসিল, লর্ড ল্যাসেন্স্ প্রমুখ গুণীজন ওই সভাকে অলঙ্কৃত করেছেন। কমন্সসভায় জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ একবার নির্বাচিত হয়ে তার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। দরকার এই ধরনের মানুষের। তাঁরা আইনসভায় গিয়ে জাতির জন্য নীতি নির্ধারণ করবেন।

'মাই রেমিনিসেন্সেস' গ্রন্থে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা রায় লিখেছেন— সেই সময়ে কিছু অ-কংগ্রেসী নেতা উঠেই সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখতেন— কিন্তু সেই বক্তব্য এত তথ্যভিত্তিক ও মর্মস্পর্শী হোত যে, সরকারপক্ষের সবাইও উৎকর্ণ হয়ে সেই বক্তৃতা শুনতেন। দরকার এমন জনপ্রতিনিধিদের। সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে থাকত সত্যতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শবোধ। যাতে শাসকদের মধ্যে পিছুটান, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদির লক্ষণ দেখা না দেয়, সেই জন্য গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো চেয়েছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার থাকবে না। আমরা এতটা বলি না— কিন্তু আন্তরিকভাবে চাই যে, নেতা ও কর্তাব্যক্তিরা হবেন সুশিক্ষিত, নির্লোভ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং আদর্শবাদী। তবেই সংবিধান রচয়িতাদের স্বপ্ন সফল হবে।

বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর দুর্গোৎসব

বাণীব্রত মিত্র

শাল পিয়ালের বনভূমি। লাল মাটির উন্মুক্ত প্রান্তর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য দেব-দেউল। পরিখা, গড় আর বিশাল বিশাল জলাশয়। সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনির সঙ্গে ভেসে আসে ধ্রুপদি-ঘরানার সুর। ইতিহাসকে আজও বুকে করে আগলে নিয়ে চলেছে— মল্লরাজ রাজধানী, বিষ্ণুপুর। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মল্লভূম ছিল সুপ্রাচীন বিশাল এক এলাকা। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের বিবরণে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও ডব্লিউ বি ওল্ড হাম জানিয়েছেন— উত্তরে সুদূর সাঁওতাল পরগণা ও দক্ষিণে মেদিনীপুরের কিছু অংশ এবং পূর্বে বর্ধমানের অংশ ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অংশ ছিল এই মল্লভূমের অন্তর্গত। সুবৃহৎ এই মল্লভূমের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর। হাজার বছর ধরে অনেক ইতিহাস খ্যাত মল্লরাজ এখানে রাজত্ব করে গেছেন। এঁদের শৌর্য-বীর্য, সঙ্গীতানুরাগ, শিল্পানুরাগ প্রভৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে বিষ্ণুপুরের অসংখ্য পুরাকীর্তি।

অতীতের সেই সব সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে না গিয়ে, বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর আদি দেবী, দেবী মৃন্ময়ী'র পূজা সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা করা যাক্। ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা জগৎমল্ল, বিষ্ণুপুরকে রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলেন। অতীতে বিষ্ণুপুর ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। রাজা জগৎমল্ল প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুরে সরিয়ে আনেন। রাজপ্রসাদ, রাজপথ, অশ্বশালা, হস্তিশালা, অস্ত্রাগার, সেনানিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করে বিষ্ণুপুরকে মল্লভূমের এক সুসজ্জিত রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলেন। ৯৯৭ খৃস্টাব্দে, রাজা জগৎমল্লই মৃন্ময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃন্ময়ীর পূজা শুরু করেন। বিষ্ণুপুরকে রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলা ও মৃন্ময়ী দেবীর পূজা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা

দেবী মৃন্ময়ী

জগৎমল্ল ছিলেন অসাধারণ বীর ও সাহসী যোদ্ধা। অতীতে বিষ্ণুপুর ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। রাজা শিকারে বার হয়ে গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। তিনি যখন একটি গাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করেন একটি সাধারণ বক্‌পাখি একটি শিকারী বাজপাখীকে তাড়া করছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে রাজার মনে বিশ্বাস হয়, যে স্থানটি নিশ্চয় কোনও ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য। কথিত আছে এরপর রাজা দেবী মৃন্ময়ীর স্বপ্নাদেশ পান এবং প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুরে সরিয়ে আনেন। এবং দেবী মৃন্ময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী মৃন্ময়ীর প্রতিমাও নাকি স্বপ্নে দর্শিত দেবীর প্রতিমূর্তি। সেই সুদীর্ঘকাল থেকে শুরু করে আজও দেবী মৃন্ময়ী বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে পূজিতা হয়ে আসছেন। বিষ্ণুপুর শহরে রাজবাড়ির যে দুর্গোৎসব সেটাই আদি ও প্রধান দুর্গোৎসব। রাজা রঘুনাথ সিংহ, বীর হাম্বীর, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ, মাধব সিংহ, গোপাল সিংহ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজাদের আমলে যে আড়ম্বর ছিল, বর্তমানে তা আর নেই। তবুও বর্তমানে রাজার বংশধরেরা পুরাতন সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে দেবী পূজার আয়োজন করেন। আজও কামানের বজ্র নির্ঘোষ সূচিত করে মহা-সন্ধির সমাপ্তি নির্ঘণ্ট। হাজার হাজার মানুষ এমনকি শত শত বিদেশী পর্যটকও উপস্থিত হন প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দেবীপূজা দর্শনার্থে।

দুর্গাপুজার ১৫ দিন পূর্বে অর্থাৎ জিতাষ্টমির দিন (নবম্যাদি) রাজবাড়ীর পূজা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যায় বিল্ববরণ হয়। বড় ঠাক্‌রন (পটে আঁকা দশভূজা দুর্গার প্রতিমূর্তি) আসেন এবং পূজিতা হন। এরপর দুর্গাপূজার আগে চতুর্থীর দিন আসেন কলাবৌ; পঞ্চমীর দিন বিসর্জন। ষষ্ঠীর দিন যথারীতি বিল্ববরণ। সপ্তমীর দিন সকালে মৃন্ময়ী মাতার ঘট আগমনের সঙ্গে আরও পূজিতা হন ছোট ঠাক্‌রন্ ও মেজ ঠাক্‌রন। বড় ঠাক্‌রনের মতোই এঁরাও বিশেষ ধরনের পটে আঁকা ছবিতে পূজিতা হন। মৃন্ময়ী প্রতিমার পাশে তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে, একই ভাবে তাঁদের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্রধারক, যাপক, পূজক ও হোম পুরোহিত পূজার কাজ সম্পন্ন করেন।

অষ্টমীর দিনে পূজা মহাসমারোহে

অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের প্রধান আকর্ষণ হলো— কামান ফাটান। হাজার হাজার মানুষের জনস্রোত উপচে পড়ে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ। বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের সমস্ত মানুষজন ছাড়াও হাজার হাজার বাইরের মানুষ উপস্থিত থাকেন এই ঐতিহাসিক পূজা দেখার জন্য। অতীতে মহাসন্ধিকাল পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপূজা সমাপন প্রভৃতি সময়গুলি পরিমাপ করা হোত জলঘড়ির সাহায্যে। ওই জলঘড়িটি বায়ুনিরোধক একটি জায়গায় জোড় বাংলা মন্দিরে রাখা থাকত। একটি তামার পাত্রে ছোট একটি ছিদ্রযুক্ত জলঘড়ির গাত্রে সময়ের পরিমাপের জন্য দাগ কাটা থাকত। একদল পণ্ডিত এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাদের বলা হোত ঘড়িয়াল। দাগকাটা পাত্রে জলের দাগ দেখে তারা পল, অনুপল পর্যন্ত হিসাব করে দিতেন। বর্তমানে জলঘড়িও নেই, নেই ঘড়িয়াল পণ্ডিতেরাও। সুতরাং এখন এখানে আর পাঁচটা জায়গার মতো রেডিওর সময় অনুযায়ী সন্ধিপূজা সমাপন, বলিদান প্রভৃতি পূজার আচার অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয়। শেষ মল্লরাজ প্রয়াত কালীপদ সিংহঠাকুরের পুত্ররা মায়ের কাছে অঞ্জলি দেন। পূর্বে চারটি সোনার তৈরি চাঁপা ফুলে অঞ্জলি দেওয়া হোত। বর্তমানে একটি সোনার তৈরি চাঁপা ফুল আতরে চুবিয়ে ফুলের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়া হয়। অতীতে, রাজারা অঞ্জলি দেওয়ার সময় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, পট্টবস্ত্র পরিধান করে মায়ের কাছে অঞ্জলি দিতেন। বর্তমানে শুধুমাত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করে মায়ের কাছে অঞ্জলি দেওয়া হয়। বলিদান হয় মাসভক্ত বলি। রাজা বলিদান করেন। সিদ্ধচাল, আতপচাল ও বিরিকলাই হলো বলির উপাদান। সন্ধিপূজা সমাপন হয় কামানের বজ্র নির্ঘোষে। প্রায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে এই কামানের শব্দ সূচিত করে সন্ধিপূজা সমাপন। অতীতে তিনটি সুবৃহৎ কামান মুরচার পাহাড় থেকে ফাটানো হোত। কামানগুলির নাম ছিল ঝুলঝাড়া, বিজলীবতী ও বাঘমুয়া। এখন শুধুমাত্র বাঘমুয়া কামানটিই ফাটানো হয়। সঙ্গে আরও তিনটি ছোট কামান মুরচার পাহাড় থেকে ফাটানো হয়। কামানে আগুন দেয় স্থানীয় তিররক গ্রামের মহা দণ্ডরা। এই মহাদণ্ডেরা সেই মহাষ্টমীর দিন দেবী মৃন্ময়ীর পূজার সঙ্গে পূজিত হন— দেবী খচ্চরবাহিনী। মড়ক, মহামারীর অবসান কল্পে পূজিত হন দেবী খচ্চরবাহিনী। রাজ পুরোহিত ছাড়া অন্য কারও প্রতিমা দর্শন নিষেধ। মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তির পিছনে পূজিতা হন এই দেবী। পাঁচপোয়া বাদশাভোগ চাল, মুগকলাই, গাওয়া ঘি, ছোলা, চিনি প্রভৃতি হলো পূজার উপকরণ। বিজয়া দশমীর দিন রাজ-অন্দরমহলে ফিরে যান দেবী খচ্চরবাহিনী। এছাড়াও অষ্টধাতু নির্মিত দেবী বিশালাক্ষীও পূজিত হন। মহাষ্টমীর দিন থেকে। ছোট্ ঠাক্রনের পটের সামনে মন্দিরের সামনে নির্মিত বেদিতে স্নান করানো হয়।

এই অনুষ্ঠানকে মহাস্নান বলে। মহানবমীর দিন যথারীতি সমস্ত আচার অনুষ্ঠানসহ পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর; বিজয়াদশমীর দিন মৃন্ময়ীমাতার ঘট বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বড় ঠাক্রন, মেজ্ ঠাক্রন ও ছোট্ ঠাকরনের ঘট বিসর্জন হয়। দেবী বিশালাক্ষী, দেবী খচ্চরবাহিনী ও দেবীমূর্তির পটগুলি রাজবাড়ির অন্দরমহলে চলে যায়। অতীতে ঘট অনয়ন ও বিসর্জন সম্পন্ন হোত শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণবাঁধ-এ। কিন্তু এখন মৃন্ময়ী মন্দিরের সামনে রাধাশ্যাম মন্দির সংলগ্ন গোপাল-সায়ের পুষ্করিণী থেকে ঘট আনা ও বিসর্জন সম্পন্ন হয়।

রাজবাড়ির এই উৎসব বিজয়াদশমীর দিন শেষ হলেও, অতীতে কিন্তু আরও দু'দিন চলত এই শারদ উৎসবের জের। দ্বাদশীর দিন, রাজবাড়ীর সন্নিকটে নিমতলা মহল্লায়, রাবণের বৃহৎ প্রতিমূর্তিকে বলি দেওয়া হোত। আজও কিন্তু এই উৎসবের ছোটখাটো একটা রূপ বিষ্ণুপুরে দেখতে পাওয়া যায়। এই উৎসবকে রাবণকাটা উৎসব বলে। রাবণের চিতায় আগুন দেওয়া হোত। রাজা ওই উৎসব দেখে পাল্কী করে রাজবাড়িতে ফিরতেন। পাথরের দুর্গ (পাথর দরজা) পার হওয়ার সময় ন'বার তোপধ্বনি দিয়ে শারদ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হোত।

আজ আর অতীতের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজারা নেই। নেই তাঁদের রাজত্ব। কালের আবর্তে সমস্ত কিছু তলিয়ে যেতে ব্যস্ত। নিঃস্ব আভিজাত্য ও প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে ধরে, মল্লভূম রাজধানী বিষ্ণুপুরে আজও রাজবাড়ির এই দুর্গোৎসব তথা দেবী মৃন্ময়ীর পূজা পালিত হয়ে চলেছে।

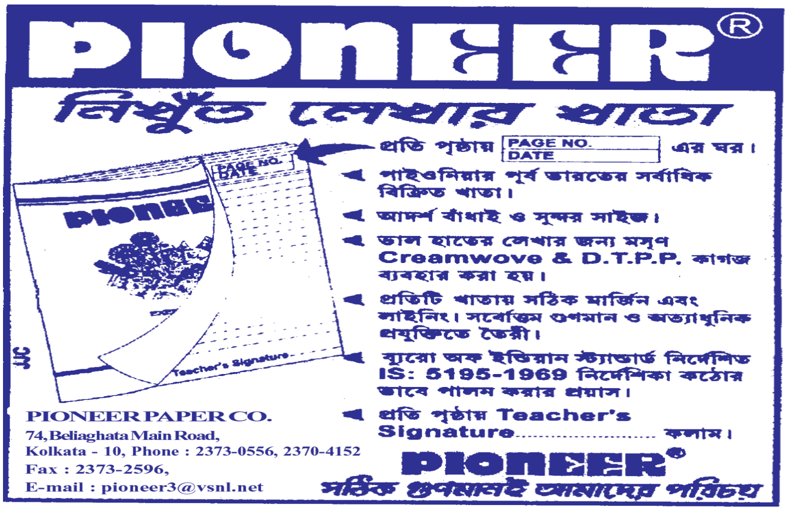

বাঁকুড়ার রাজবাড়ির দুর্গোৎসব

অর্ণব নাগ

রাজা ও রাজত্ব দুই-ই যখন অপসৃয়মান, তখন রাজ-আভিজাত্য বজায় থাকবে এমনটা ভাবা অনুচিত। রাত পোহালে শারদ-প্রাতে বাঁশিটা কার হাতে দেওয়া হবে তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে (স্মরণ করুন গুরুদেবের গান, 'আমার রাত পোহাল শারদ-প্রাতে, আমি বাঁশি দিয়ে যাব কাহার হাতে'), কিন্তু শারদ প্রাতে আভিজাত্যের ব্যাটন যে উত্তর-পুরুষের হাতেই বর্তায় তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটা যেমন কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ি কিংবা কুচবিহার রাজবাড়ির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি ঊষরভূমের রাজবাড়ির ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যত্যয় ঘটছে না। মল্লভূম বাঁকুড়ার চারটি রাজপরিবারের দুর্গোৎসব যথা খাতড়া রাজবাড়ি, অম্বিকানগরের রাজবাড়ি, সিমলাপাল রাজবাড়ি এবং মালিয়াড়া রাজবাড়ির দুর্গোৎসব আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারই কিছু আমেজ রইলো স্বস্তিকা-র পাঠক-পাঠিকাদের জন্য।

দশ আনার দুর্গাপুজো

দশ আনার দুর্গাপুজো মানে খাতড়া রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। একে দশ আনার পুজো বলার কারণটা ঐতিহাসিক। পারিবারিক কুলুজী অনুসারে, আদতে রাজস্থানের ঢোলপুরের বাসিন্দা এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায় এসেছিলেন প্রায় চারশ' বছর পূর্বে। আসার পর এঁদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাজন হয়। একপক্ষ পান দশ আনা সম্পত্তি, অপরপক্ষ ছ' আনা। দশ আনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা খাতড়াতেই স্থাপন করেন তাঁদের জমিদারি, পত্তন করেন তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজো। ছ' আনার কথায় পরে আসছি।

বর্তমানে খাতড়া রাজবাড়ির রাজপ্রাসাদ না থাকলেও, অনবদ্য স্থাপত্য-কীর্তির দুর্গা মন্দিরটি আপাতত টিকে রয়েছে। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির মতোই মহাষষ্ঠীর দিনে এখানে পুজারম্ভ হয় না। পুজো শুরু হয় জিতাষ্টমী-র (দুর্গাপুজোর ১৫ দিন আগে) দিন থেকে। পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় চণ্ডীপাঠ। রেডিওয়ে মহালয়ার সকাল মানেই যেমন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, তেমনি খাতড়া রাজবাড়ির দুর্গোৎসব মানেই 'দক্ষিণ বাঁকুড়ার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র' মতিলাল শাস্ত্রী। বর্তমানে প্রয়াত শাস্ত্রীজী ছিলেন গোপালপুর অঞ্চলের কেঞ্জাকুড়া গ্রামের বাসিন্দা। খাতড়া রাজবাড়ির পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুবছর ধরে। তাঁর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ যাঁরা একবার শুনেছেন, তাঁরা জীবনে তা ভুলতে পারবেন না।

রাজবাড়ির পুজোয় দেবীকে বিভিন্ন তরকারি, ডাল ও মাছের ভোগ দেওয়া হয়। জিতাষ্টমী থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে ডাল সহযোগে ভোগ নিবেদিত হয় মায়ের উদ্দেশ্যে। এর সঙ্গে কিলো কিলো মাছের ভোগ নিবেদিত হয়। এরপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কম-বেশি ৫০ কেজি মাছের ভোগ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। সপ্তমী-র দিন ৫০ কেজি চালের অন্নভোগের সঙ্গে ১০-১৫ কেজি করে ডাল-তরকারিও ভোগ দেওয়া হয়।

ছ' আনার দুর্গাপুজো

অন্যদিকে ঢোলপুর থেকে সুদূর খাতড়ায় আসা রাজপরিবারের ছ' আনার অংশীদাররা কংসাবতী নদী ও কুমারী নদী দিয়ে ঘেরা জঙ্গলে ঢাকা নির্জন পরিবেশে অম্বিকা নগরে স্থাপন করেন তাঁদের রাজ্যপাট। পরে এঁদেরই এক বংশধর সেখানে স্থাপন করেন সুরম্য দেব-মন্দির। সেখানে দুই দেব-দেবীর পুজো শুরু হয়। এঁরা হলেন দেবী অম্বিকা ও কালাচাঁদ। অনুমান দেবীর নামেই নামাঙ্কিত হয় রাজধানী অম্বিকানগর। এই রাজপরিবারের পাটরাণী মুকুটমণির নাম রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ পর্যটন-বাণিজ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় স্থানে থাকা মুকুটমণিপুরের নামকরণ তাঁর নামেই নাকি হয়েছে। এই পরিবারের কাছে দেবী অম্বিকা এবং কালাচাঁদ দু' জনেই খুব জাগ্রত। প্রাচীনকালে রাজারা যুদ্ধে বা শিকারে গেলে ওই গৃহদেবতা দ্বয়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে যেতেন। আবার যুদ্ধ জয় বা শিকার করে ফিরে এলে তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করে তবেই বাড়িতে ঢুকতেন। চারিদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত দুর্গ নগরী হিসেবে একে গড়ে তোলা হয়। এই নগরের প্রান্তে ছিলেন প্রান্তিক দেবী সাবিত্রী। যুদ্ধ জয়ের শেষে ফিরে এলে রাজারা গৃহদেবতা-দ্বয়ের কাছে যাবার আগে স্বাভাবিকভাবেই প্রান্তিক দেবীর চরণসমীপে উপস্থিত হতেন ও আশিস প্রার্থনা করতেন।

প্রান্তিক দেবী সাবিত্রী এঁদের কাছে এতটাই সম্মানের যে নবমীর দিন পুজোর

পর রাজবাড়ি থেকে পুজোর বিভিন্ন উপকরণ সহ বাজনা বাজিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা কুমারী নদীর তীরে দেবী সাবিত্রীর সমীপে উপস্থিত হয় এবং পরম নিষ্ঠায় ও ভক্তিতে তাঁরা পুজো নিবেদন করেন। এমনকী ছাগ বলিও হয়। এই রাজবাড়ির পুজোর মান্যতা কতটা তার সুস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায় মহাষ্টমীর দিন সন্ধি পুজোর সময়। পুরোনো দিনের মতো এখানকার পুজোয় তোপধ্বনির ব্যবস্থা পূর্ববৎ বজায় রয়েছে এবং সন্ধিপুজোর লগ্নে এঁদের তোপধ্বনি শুনেই এই অঞ্চলের বহু পুজো- মণ্ডপে সন্ধিপুজো শুরু হয়। পুজো হয় শাক্ত মতে। তবে এই পুজোয় একটা ব্যাপার আধুনিক যুগের মানুষের মেনে নিতে কষ্ট হতে পারে। সেটা হলো সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে এখনও শতাধিক পশুবলি হয়ে থাকে। পুজোর সবরকম মিষ্টি তৈরি করতে বাইরে থেকে হালুইকর আনা হয় এবং এর তদারকিতে থাকেন বয়স্ক অন্তপুরিকারা।

তবে এই রাজবাড়ির পুজো শুধু পরিবারের সদস্যদেরই পুজো নয়। এই পুজো যেন ওই এলাকার মানুষেরই। সারা বছর তাঁরা অধীর আগ্রহে থাকেন কবে পুজো আসবে আর গোটা গ্রাম মেতে উঠবে মোরগ লড়াই, কাঠি নাচ, পুতুলনাচ, ছৌ নাচের মতো লোক অনুষ্ঠানে। শুধু অম্বিকানগরই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রাম মায় বিশ্বেরও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক এসে সামিল হন রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে।

সিমলাপাল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল রাজবাড়ির পুজো দু'শো বছর অতিক্রম করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সাবেক রীতির একচালার প্রতিমা এঁদের। এই পুজোর বিশেষত্ব হলো পুজোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রাখা। পুজো হয় শাক্ত রীতিতে। একসময় মহানবমীর দিন শতাধিক পশুবলি হোত। কিন্তু পরবর্তীকালে একটি বিশেষ ঘটনায় পুজোয় বলি বন্ধ হয়ে যায়। আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে বলির একটি ছাগল হন্তারকের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে সোজা এসে পড়ে যুবরাজ কল্যাণীপ্রসাদ সিংহচৌধুরীর পদতলে। অবাক বিস্ময়ে যুবরাজ দেখলেন ছাগলটির চোখে অশ্রুধারা। তার প্রাণভিক্ষার আকুতি নাড়া দিল কল্যাণীপ্রসাদকে। পূজারীদের পুজোর অঙ্গহানি হবার চরম ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন না হন্তারকের হাতে অবলা সেই জীবটিকে তুলে দিতে। ঘটনাচক্রে সেই বছরই অকস্মাৎ মারা গেলেন তিনি। সেই থেকে সিমলাপাল রাজবাড়িতে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়। এখন চালকুমড়ো, আখ, ফল ইত্যাদি বলি হয়। শাক্ত মতে পুজো হলেও পরম বৈষ্ণব বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের তোপধ্বনি শুনেই রাজবাড়ির সন্ধিপুজোর সূচনা হয়। রাজ আভিজাত্য কিংবা ঠাট-বাটের কোনও খামতি আজও চোখে পড়ে না। সেইসঙ্গে পারিবারিক ভক্তি, নিষ্ঠা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য এখনও অম্লান। সপ্তমীর দিন সাড়ম্বরে কলাবৌ স্নান করিয়ে ঘট আনার পর নানান উপাচারের মধ্যে দিয়ে চারদিন পুজোর আনন্দে মেতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও প্রতি ঘণ্টা অন্তর পুজো পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক রীতি ও পর্ব আকর্ষণ করে বাইরের মানুষকেও।

মালিয়াড়া রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর অন্যতম কৃতী সৈনিক ঘরবাস অধুর্য একটি অধুনাবিস্মৃত নাম। আকবর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর আপন দেশে এক রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে যতটা জায়গা ঘুরতে পারবেন, ততটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর রাজত্ব। সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন ঘরবাস অধুর্য। যখন ভোরের আলো ফুটল তখন বন্ধ করলেন সেই ছোটা। দেখলেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন মালিয়াড়ায়। আকবরের আদেশে বর্ধমানের মহারাজা তাঁর রাজত্বাধীন বাঁকুড়ার ওই বর্ধিষ্ণু এলাকা দান করেন ঘরবাস অধুর্য-কে। এবং তাঁকে সেখানকার রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠা হলো মালিয়াড়া-রাজ ও রাজত্বের। তবে একে ফোকটে পাওয়া রাজত্ব কিংবা আকবরের ভয়ে বর্ধমান রাজারা বাধ্য হয়েছে তাঁদের রাজত্বের ভাগ ছেড়েছেন এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না। কারণ ঘরবাস অধুর্য যখন এই এলাকার রাজত্ব পান তখন দস্যু আর তস্করের উপদ্রপে তিষ্ঠোনোই দায় হয়ে উঠেছিল। প্রথমে রাজা ঘরবাস ও পরবর্তীতে তাঁর বংশধররা এদের দমন করে মালিয়াড়ায় সুখ-শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল। যার স্বীকৃতিস্বরূপ সেখানকার রাজাদের 'অধুর্য' থেকে 'চন্দ্রাধুর্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন বর্ধমানের রাজারা।

পরবর্তী কোনও এক সময়ে রাজবাটীর অভ্যন্তরেই নির্মিত হয় সুন্দর কারুকার্য করা দেবীর মন্দির। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা। মন্দিরের অদূরেই বসতো রাজদরবার। মন্দিরের সামনেই ছিল সুবৃহৎ আটচালা। মন্দিরের সিংহাসন রুপো দিয়ে তৈরি, মায়ের মূর্তি স্বর্ণখচিত। সিংহবাহিনী মায়ের পায়ের তলায় থাকে একটি দু'মুখো তরবারি। রীতি অনুযায়ী, বংশের পরাক্রমশালী কোনও রাজপুরুষের এই তরবারি স্পর্শে সূচনা হবে পুজোর। সে রাজাও যখন নেই আর রাজত্বও যখন বিলুপ্ত, তখন পরাক্রম দেখানোর সুযোগটা কোথায়? অগত্যা রাজপুরোহিত-ই তাঁর পরাক্রম দেখান, এই তরবারি স্পর্শ করে। নইলে পুজো আরম্ভই হবে না যে! তবে রাজবাড়ির কামানের গর্জন আজও অমলিন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর ব্রাহ্মমুহূর্তে স্বয়ং রাজারা বন্দুকের গুলির ফায়ার করার পর গর্জে ওঠে রাজবাড়ির কামান। আর সেই শব্দ শ্রবণমাত্রই ওই অঞ্চলের সবক'টি পুজো মণ্ডপে সন্ধিপুজোর উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে রাজবাড়ির পুজো শুরু হয়ে যায় মহালয়ার পরদিন থেকেই। বাড়ির বয়স্কা মহিলা অর্থাৎ রাজমাতার তত্ত্বাবধানেই ভিয়েনদার দিয়ে রকমারি মিষ্টি, মুড়কি, নাড়ু, পিঠে-পুলি ইত্যাদি তৈরি হয়। পুজোর যাবতীয় যোগাড়ের

তত্ত্বাবধান করেন স্বয়ং রাজপুরোহিত। একসময় মালিয়াড়া রাজবাড়িতেও পড়েছিল বাবু-বিলাসের রেশ। পুজোয় কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঈজীরা রাজদরবারে এসে মনোরঞ্জন করে যেতেন, শুধু রাজপরিবারের সদস্য কিংবা তাদের মোসাহেব কিংবা মন্ত্রী-শাস্ত্রীরাই নন, সাধারণ প্রজারাও বাঈনাচ দেখার সুযোগ পেত। পুজোয় প্রচুর বাজি পোড়ানোও হোত। মালিয়াড়ার মালাকারেরা যত্নসহকারে তৈরি করেন সেইসব আতসবাজি। রাজমহিমা বর্তমানে অস্তমিত হলেও পুরনো রীতি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন মালিয়াড়া রাজপরিবারের উত্তরপুরুষেরা। সম্বল বলতে সরকারের বার্ষিক অনুদান ১৪৮০ টাকা (এই সামান্য টাকাটাও আবার নিয়মিত নয়) এবং জমিদারির কয়েকশ' একরের জলকর সহ যমুনা বাঁধের মাছ ও পাত্রসায়রের পুকুর থেকে লক্ষাধিক টাকার আয়। তাতেই রাজ-ঐতিহ্য বাঁচিয়ে চলে আসছে পুজো।

ঋণগ্রন্থ : বঙ্গের শারদোৎসব ও ব্যক্তিক্রমী দুর্গপুজো, শিবশংকর ঘোষ।

পুরুলিয়ার জয়পুর রাজ পরিবারের স্বর্ণদুর্গার পূজা

এমন এক সময় ছিল যখন সীমান্ত জেলা পুরুলিয়াতেও বহু রাজপরিবারের অস্তিত্ব ছিল। যারা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে নিজ নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজনে মেতে উঠত। পুরুলিয়া জেলার তেমনি এক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার হলো বরাভূম এস্টেটের জয়পুরের রাজবাড়ি। এখানে কয়েকশ' বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আড়াই ফুট উচ্চতার কনক দুর্গা, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকার মতো। এত মূল্যবান মূর্তি জমিদারি আমলে পাইক বরকন্দাজ, সিপাই সান্ত্রির পাহারায় পূজিত হোত। বর্তমানে পূজার চারদিন মাত্র পুলিশ পাহারায় পূজা মণ্ডপে রেখে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনে পূজিত হয়। পূজার পর পুনরায় তা সুরক্ষিত এলাকায় নিয়ে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তায় সংরক্ষিত হয়। এ পূজায় এখনও একসের সোনা ও দেড়মন রূপার চাঁদোয়া প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

নানান অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পারিবারিক নিয়ম-নিষ্ঠায় পূজা পরিচালিত হয়। পূর্বে এই পূজায় রাজ-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে জাঁকজমকের অভাব ছিল না। ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে সরকার কর্তৃক এই রাজ এস্টেট অধিগৃহীত হয়। ফলে তখন থেকেই পরিবারে পড়তির সূচনা। এই পূজাকে ঘিরে আগে বহু অতিথি অভ্যাগতের প্রাচুর্য ছিল। শাক্ত মতে পূজা, তাই পূজায় বহু বলিদানের ব্যবস্থাও ছিল। এখনও আছে, তবে তার সংখ্যাও কমে গেছে। পূজার জন্য আগে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে তাও নেই। তাই এখন অতি সাধারণ ভাবেই এই পূজা চলে আসছে। তবুও এই কনক দুর্গা দর্শনের জন্য এখনও পূজার চারদিন প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে।

শিবশংকর ঘোষ লিখিত 'বঙ্গের শারদোৎসব ও ব্যতিক্রমী দুর্গাপূজা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল—৯৮৭৪৩৯৮৩৩৭/৮৮২০৩২৯৪৬৩

গ্যাংটক-নামচি-পেলিং-ইয়ুমথাং ▫ দার্জিলিং ▫ পুরী ▫ সিমলা-কুলু-মানালী ▫ কাশ্মীর ▫ ভাইজ্যাক-আরাকু ▫ দিল্লী-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-মুসৌরী ▫ কেরালা ▫ গোয়া ▫ মুম্বাই ▫ আন্দামান ▫ শিলং-চেরাপুঞ্জি-গৌহাটি ▫ দেওঘর ▫ সুন্দরবন

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজার দুর্গোৎসব

নবকুমার ভট্টাচার্য

মধ্যপ্রদেশের ধারানগর থেকে বিহারে আসা বর্তমানে বাংলা পঞ্চকোট রাজবংশ ও বঙ্গের সেনবংশের বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের পালিতা কন্যা কুমারী সাধনার বিবাহের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই পুজো প্রচলনের ইতিহাস। সুপ্রাচীনকালে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূমের এই এলাকার মানুষের কাছে শিবই ছিলেন মুখ্য দেবতা। সেজন্য এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শিব মন্দিরের আধিক্য বেশি।

শোনা যায়, বর্তমানে পুরুলিয়ার উত্তর-পূর্বে যেখানে পঞ্চকোট পাহাড়ের অবস্থান সেখানেই ছিল পঞ্চকোট রাজবংশের গড়। সেনগড়ের নৃপতি বল্লাল সেনের ভাট দেবদাস চট্টোপাধ্যায় একদিন পঞ্চকোটের মহারাজা কল্যাণ শেখরের কাছে বল্লাল সেনের কন্যা সাধনার বিবাহের প্রস্তাব আনেন। দুই রাজবংশের মতানুসারে একদিন বিবাহের দিনও স্থির হয়। রাজকুমারী সাধনা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী বুদ্ধিমতী এবং অধ্যাত্মপরায়ণা। প্রাসাদে সাধনার প্রতিদিনের কাজ ছিল সেনবংশের কুলদেবী শ্যামারূপার সেবা করা।

হিন্দুশাস্ত্র ও আচার অনুযায়ী বিয়ে তো হলো। স্বামী কল্যাণশেখরের সঙ্গে পঞ্চকোটে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বে কল্যাণশেখরকে সাধনা বললেন, আমি যে দেবীকে প্রতিদিন পুজো করতাম সেই শ্যামারূপা দেবীকে এবং একটি কালো স্ত্রী ঘোড়ার সঙ্গে দেবীর অসি বাবার কাছে চেয়ে নাও। সাধনার কথামতো কল্যাণশেখর সেগুলি বল্লাল সেনের কাছে চেয়ে বসায় রাজা পড়লেন মহা ফাঁপরে। কুলদেবীকে প্রাণাধিক মেয়ের হাতে তুলে দিতে হবে? মনে কষ্ট হলেও তিনি কুলদেবী শ্যামারূপাকে সাধনার হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু শর্ত থাকল, দেবীকে যেন কোথাও ভূমিতে অবতরণ না করানো হয়। যদিও বংশের কুলদেবীকে পঞ্চকোট রাজের হাতে প্রত্যর্পণ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি। একরাতে কল্যাণশেখর নববধূকে নিয়ে কালো ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চকোট অভিমুখে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল সেন বংশের কুলদেবী অসিসহ শ্যামরূপা। সারারাত ঘোড়ার পিঠে সফর করে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে কল্যাণ শেখর নিজ রাজ্যের কিছু পূর্বে সোবনপুর গ্রামের পুরোহিত রোহিণী দেওঘারিয়ার বাড়িতে বিশ্রামের জন্য থামলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ মন্দিরে গিয়ে যখন দেখলেন মন্দির ফাঁকা তখন তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে স্থির করলেন কল্যাণ শেখরের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেবীকে ফিরিয়ে আনবেন। ভাবামাত্র লক্ষ্মণ সৈন্যসামন্তসহ চললেন পঞ্চকোটের দিকে। সোবনপুরে এসে কল্যাণ শেখরকে ধরতেও পারলেন। সাধনা ভ্রাতার রুদ্ররূপ শান্ত করে অনেক কষ্টে রাজ্যে ফেরত পাঠালেন।

সোবনপুরের অদূরে চাল্লাদহ নামে নদীতীরে জঙ্গলের মধ্যে একটি স্থান কল্যাণশেখরের পছন্দ হওয়ায় তিনি ওই জঙ্গলে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে রোহিণীর বাড়ি থেকে দেবীকে তুলে যখন ফের পঞ্চকোট যাত্রা করতে যাচ্ছেন তখন দেখলেন দেবীকে মাটি থেকে তোলা দুঃসাধ্য। শেষে সাধনার মনে পড়ল পিতার শর্ত ও সাবধানবাণী— দেবীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেও নিজ রাজ্যের পূর্বে কোথাও অবতরণ করা চলবে না। দিন কাটল, রাত নামল। সাধনা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লেন। কল্যাণশেখর যখন দেখলেন

কিছুতেই দেবী শ্যামারূপাকে নড়ানো যাচ্ছে না, বৃথা চেষ্টা। তখন তিনি অর্ধাঙ্গিনীকে বললেন, 'দেবীকে যখন নিজ রাজ্যে নিয়ে যেতেই পারব না তখন আমি আত্মবলি দিচ্ছি দেবীর কাছে, তুমিও আমায় অনুসরণ করো।' ঠিক তখনই কল্যাণ ও সাধনা আধো ঘুম চোখে শুনলেন কেউ যেন বলছে, 'এ কাজ কোরো না। আমি এখানে থেকেই তোমার রাজ্যের মঙ্গল করব। আমায় পুজো করবে, আমি নিজে গিয়ে তোমাদের পুজো নেব।' সাধনা আকুল নয়নে ভক্তিভাবে দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কেমন করে জানব তুমি এসেছ।' অদৃশ্য কণ্ঠ উত্তর দিল, 'প্রতিবছর মহাঅষ্টমীতে আমার পদচিহ্ন দেখতে পাবে।'

পরেরদিন রাজধানী পঞ্চকোটে যাওয়ার পূর্বে কল্যাণশেখর রোহিণী দেওঘরিয়াকে ডেকে গোটা ঘটনা বলে তাঁকেই দেবীর পুজোয় পুরোহিত ও সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত করলেন। দেবীর নতুন নামকরণ করলেন কল্যাণেশ্বরী। আজও বর্ধমানের মাইথন জলাধারের অদূরে ঐ স্থান কল্যাণেশ্বরী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কল্যাণশেখর পুরোহিতকে দেবীর পুজোর খরচ চালানোর জন্য সোবনপুর, দেবীপুর, দিগারি, ধবাগান ও জামিরকুঁড়ি— এই পাঁচটি গ্রাম দান করলেন। রাজ্যে ফিরে দেবীর স্বপ্ন পেয়ে নিজের রাজধারিণী দেবীর চতুর্ভুজামূর্তি গড়ে মন্দির স্থাপন করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে ওই ঘটনার পর থেকে পঞ্চকোট রাজবংশের দুর্গাপুজোর সূচনা। ঐতিহাসিকের মতে পঞ্চকোট রাজবংশে কল্যাণ শেখরের রাজত্বকাল ইং ১২৯১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তাই পঞ্চকোট রাজবংশের পুজো প্রায় ৭০০ বছরের প্রাচীন। আজও পুরুলিয়ার কাশীপুরে পঞ্চকোট রাজাদের পুজো হয়। কল্যাণ শেখরের সেই স্বপ্নাদিষ্ট চতুর্ভুজা দেবী মূর্তিই এখানে পূজিতা হন শাক্তমতে। দেবীর নাম এখানে 'রাজরাজেশ্বরী'। এখনও মহাঅষ্টমীর সন্ধিক্ষণে পুজোর সময় সোনার সিন্দুরের থালায় মায়ের পদচিহ্ন পড়ে।

বর্তমানে মার্বেল পাথরে মোড়া মন্দির ১৯২৪ সালে নির্মিত হয়েছে। তবে মন্দিরের সে জৌলুস আজ আর নেই। পুজোর সময় রাজরাজেশ্বরী দেবী মাতার পুজো হয় প্রাচীন ঐতিহ্য মেনেই। রাজতন্ত্র না থাকায় আভিজাত্য ও আড়ম্বর আর নেই বললেই চলে। অথচ একসময় কত পাঁঠা পড়ত পুজোয়। এক একদিন চারশো পাঁচশো বলি হয়েছে। বলির সময় কামান দাগা হোত। সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত এলাকায়। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে লোকে মুখে মুখে খবর যেত কাশীপুরের রাজবাড়িতে সন্ধিপুজো শেষ হয়েছে। এখানে পুজোর পনেরো দিন পূর্বে দেবীপক্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হোত পুজো অর্থাৎ কৃষ্ণনবমী থেকে পুজো আরম্ভ হোত। ভোগ হোত। শয়ে শয়ে লোক প্রসাদ পেত। এখনও দেবীপক্ষ পড়ে। পুজো হয়। কিন্তু জৌলুস হারিয়েছে পুজো। সেই যুগ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সে হাতি-ঘোড়াও নেই। মন্দিরের অদূরে ছাতামাড়া গ্রামে এখন ছাতাও ওড়ে না পুজোর সময়। মার্বেলে মোড়া রং চটে যাওয়া মন্দিরে বিশাল ঝাড়লণ্ঠনের উপর পুরু ধুলোর আস্তরণ জমেছে। তবুও রাজরাজেশ্বরীর মহিমা নষ্ট হয়নি।

'মল্লের রা, শিখরে পা, সাক্ষাৎ দেখবি তো নদে শান্তিপুরে যা'। —সুপরিচিত প্রবাদ চালু রয়েছে এই অঞ্চলে। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবীণ সঙ্গীত সাধক গুরুপ্রসাদ সরকারের 'বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মল্লভূমিতে শুনা যেত আকাশমার্গে বহুলোকের 'মা' 'মা' রব। শিখরভূমি সিঁদুরের ওপর পড়তো মায়ের পদচিহ্ন। আর শান্তিপুরে মাকে দেখা যেত পূর্ণ দৈব মহিমায়।' প্রবাদের অংশ 'শিখরে পা'— শিখর অর্থাৎ শিখরভূম। বর্তমান পুরুলিয়া জেলাকেই শিখরভূম বলা হয়েছে। শিখরভূমে সিঁদুরের ওপর পড়তো মৃন্ময়ী দেবীর পায়ের ছাপ। উল্লেখ্য রাজরাজেশ্বরী মায়ের পায়ের ছাপ পড়তো মহাঅষ্টমীতে। প্রসঙ্গত এই অঞ্চলে মহাঅষ্টমীতেই জাঁকজমক ছিল সব থেকে বেশি। তবে মল্লভূমের দুর্গা সিংহবাহিনী নয়। খচ্চরবাহিনী।

নেত্রদান মহাদান

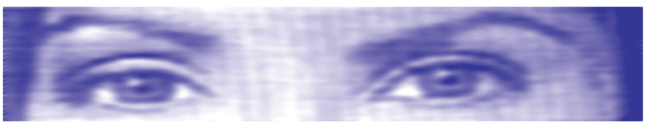

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

রবীন্দ্রনাথের একটি গান ও এক পরিবার

মায়ের পছন্দের গানের মধ্যে থাকায় অনেকবার শুনেছে দেবজিৎ। একা বসে কোনও কাজ করছে হঠাৎ গেয়ে উঠত। যখন খুব ছোটো ছিল মা নানারকম গান গেয়ে ঘুম পাড়াত। নিশ্চয়ই ওই গানটাও ছিল। মা ছড়ার গানও গাইতে পারত। বেশ দুলুনির ঘোর লাগত। মায়ের কাছে শুনে শুনে অনেকগুলো গান হুবহু মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। গাইত যখন অনেকে মন দিয়ে শুনত। তখনও লিখতে পড়তে শেখেনি। মা একা থাকার সময় কিংবা পুজো করার সময় যখন গাইত তখন দেখেছে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেবজিৎ বলেছে, 'মা তুমি কাঁদছো? যে গান গাইলে কান্না পায় তা গাইতে হবে না।' মা বলত চোখ মুছে, 'কোথায় কাঁদছি! এই গান গাইতে ভালো লাগে বলে গাই। এই গান গেয়েই তো পুজো করি।' ঠাকুমার সঙ্গে খুব ভাব দেবজিতের। বলেছিল, 'জানো, ওই গানটা গাইবার সময় মা কাঁদে!' ঠাকুমা বলেছিল, 'হ্যাঁ দাদুভাই, ওই গান আমাকেও কাঁদায়। আমিও গাই। তবে তোমার মায়ের মতো গাইতে পারি না।' দেবজিৎ জবাব দিয়েছিল, 'গানটা তো আমিও গাইতে পারি, আমি তো কাঁদিনা।' ঠাকুমা, 'তোমার মনে অনেক জোর তাই কাঁদো না। আমাদের মনের জোর কম তাই কাঁদি। যাক্ তুমি গানটা শোনাও।' দেবজিৎ ঠাকুমার সামনে বসে গেয়েছে, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব/ ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছো, জীবন নব নব।' তার গান শুনে অনেকে চলে এসেছে। কাছাকাছি এসে বসে পড়েছে। মা-ও রয়েছে। ঠাকুমা বলল, 'গাও গেয়ে যাও।'

দেবজিৎ সোজা হয়ে বসে গাইছে। 'কত যে গিরি কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে / কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে/ কাহারে তাহা কব।' মায়ের দিকে তাকাল। এক মনে শুনছে। ইশারায় বলল, 'ঠিক আছে গাইতে থাকো।' ঠাকুমা তো তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছে ভালো লাগা কাজ করছে। দেবজিতের মনের মধ্যে গানটা ছবির মতো চেহারা নিয়েছে। গাইতে থাকল, 'তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি/ হারালো সীমা বিপুল হরষে উথলে উঠে বাণী।' ঘরে এসে বসেছে ছোটো পিসি, কাকিমা, আরও কেউ কেউ। দেবজিৎ একবার মায়ের দিকে তাকাল। না, কাঁদছে না। ছেলে ঠিকমতো গাইছে কিনা দেখছে? মায়ের খুব প্রিয় গান তো! অন্য কেউ ভুল গাইলে হয়তো কিছু বলবে না। নিজের ছেলে ভুল সুর ভুল উচ্চারণে গাইলে মানতে পারবে না। মায়ের সামনে তো পরীক্ষা দিচ্ছে না। ঠাকুমার কথায় গাইছিল। আর নিজের ভালো লাগাও তার সঙ্গে কাজ করছিল, দেবজিৎ গাইতে থাকল, 'আমার শুধু একটি মুঠি ভরি/ দিতেছ দান দিবস- বিভাবরী—/ হলো না সারা কত-না যুগ ধরি/ কেবলই আমি লব।' আবার ফিরে আসে প্রথমে। 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—/ ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব।' অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে থামল দেবজিৎ। মা উঠে নিজের কাজে চলে গেলো। ঠাকুমা আদর করে কাছে ডেকে নিলো। চুমু খেয়ে বলল, 'সন্দেশ আনিয়ে রেখেছি আগে। খাও! বিকেলে আইসক্রিম খাওয়াবো।'

আজ ঠাকুমাও নেই, মা-ও নেই। সব ছবিগুলো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। একটু বড়ো হয়ে দেখেছিল রবীন্দ্রনাথের একটা ছবির পাশে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় গানটা লেখা। বাবা বাঁধিয়ে রেখেছিল বসার ঘরে। ওঠা ছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের পঁচিশে বৈশাখের ফোল্ডার। শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রজন্মোৎসবের সময়। গানটা যে বাবারও খুব পছন্দের তা বুঝেছিল। এক সময় বাবার কাছেই শুনেছিল, ওটা গীতাঞ্জলির গান। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তখন প্রথম গান ছিল 'আমারে তুমি অশেষ করেছ—'

পরে পরে ভালো লাগার সূত্রেই বিভিন্ন রবীন্দ্র গান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা হয়ে যায় দেবজিতের। একেই হয়তো বলা যায় আন্তরিক রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার গরজ বা তাগিদ। গানটা লেখা হয়েছিল ১৩১৯ সালের ৭ বৈশাখে। গানটা পরে অন্তর্ভুক্ত হয় 'গীতিমাল্যতে' ১৯১২-তে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়। ইংরেজ কবি ইয়েটস ভূমিকা লেখেন ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে। তারপরে বই প্রকাশিত হয়। ইংরেজ কবি অনুবাদের মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে। কবিদের তৃতীয় চোখ থাকে আর স্বতন্ত্র অনুভবশক্তি। ইয়েটস অভিভূত হন। তিনি শোনেননি মূল বাংলা ভাষায় গানটি। রবীন্দ্রনাথ নিজে হয়তো বার বার গেয়েছেন। ইংরেজি গদ্যে অনুবাদের পর পড়ে বাংলা-না- জানা কারও মনে হতেই পারে এতো প্রার্থনা। ঈশ্বরের কাছে একান্তে বসে ঈশ্বরকে প্রণাম জানানো সর্বসত্তা দিয়ে। দেবজিৎ ইংরেজি গীতাঞ্জলিও পড়েছে। তার কাছে অন্যভাবে বার বার ফিরে এসেছে 'গীতিমাল্য'র কবিতা বা গান। গানে গানেই তো নিবেদন। করজোড়ে প্রণাম আর অঞ্জলি প্রদান। 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব—/ ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছো জীবন নব নব।'

দেবজিতের ব্যাগে সবসময় একটা 'গীতাঞ্জলি' আর একটা 'গীতিমাল্য' থাকে। মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক গান বার বার পড়ে মুখস্থ সমস্ত যতিচিহ্ন সমেত। বই দুটো সঙ্গে থাকলে মানসিক জোর পায়। ভাবে, তার পছন্দের কথাগুলো ধরা আছে দুই মলাটের মধ্যে। দেবজিত মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের স্কেচ আঁকে ছোট ছোট কার্ডে। পাশে লিখে ফেলে 'আমারে তুমি অশেষ করেছ—'। অন্য গানও লেখে। তবে ওই গানটাই বেশি লেখা হয়ে যায়। অন্যরকম অনুরাগ হয়তো জড়িয়ে থাকে। যা বোধহয় কিছুটা পরম্পরাবাহিত। অল্পবয়সে মাকে দেখেছিল ওই গান গাইতে গাইতে কাঁদতে। সেদিন বোঝেনি। মা চলে যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধেবেলা গানটান হোত সবাই জড়ো হয়ে। দেবজিৎ মায়ের পছন্দের গান 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' গেয়েছে। গাইতে গাইতে ভিতর থেকে কান্না যেন উঠে আসছিল। মেয়ে দেবাদৃতা তার মা-কে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঠাকুমা চলে যেতে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না?' দেবাদৃতাকে কাছে টেনে নিয়েছিল তার মা। শ্রাদ্ধের দিন সন্ধেবেলা একসঙ্গে সকলে বসে স্মৃতিচারণ হচ্ছে। ঠাকুমার ছবির দিকে তাকিয়ে নির্ভুল সুরে গেয়ে উঠল দেবাদৃতা, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ—' দেবজিৎ অবাক হয়ে শুনতে থাকল সাত বছরের কন্যার নিবেদন। ঠাকুমার প্রিয় নাতনি। তার কষ্টও কম নয়। দেবাদৃতা গাইছিল একা। মনে মনে গাইছিল সকলে। দেবজিৎও।

চিঠিপত্র

বিবেকানন্দ ও ইসলাম

“বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম” নিবন্ধে বইটির লেখক হোসেনুর রহমান স্বামীজীর মন্তব্যের ভিত্তিতে দাবি করেছেন যে, ‘বেদান্তের ‘সাম্য’ ইসলাম ধর্মে ‘বাস্তবিকভাবে বর্তমান’, অর্থাৎ তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়। ডঃ রহমানের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডঃ রুদ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য যে, আলোচ্য দুই মতের ‘সাম্য’ প্রকৃতিতে ভিন্ন এবং সাযুজ্যহীন। অতএব স্বামীজীর ইসলামে সাম্য চিন্তাটাই ‘অপধারণা’। স্বামীজীর মন্তব্য ছিল ইসলামে বিভেদের বদলে সমস্ত জাতিটাই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি একদিক থেকে ঠিকই। বেদান্তের সাম্য নিষ্কলুষ, ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর বিশ্ববোধক তত্ত্ব। কিন্তু ইসলামের সাম্য সংকীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থ কেন্দ্রিক এবং তার প্রেরণা কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে হিংসা। ইতিহাস তার সাক্ষী।

এসব সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে ইসলামে একধরণের ‘সাম্য’ বর্তমান, যদিও তা সমাজের কাঠামোতে মাত্র। সমাজ চিত্তে তার পরিচয় নেই। ভুল-ঠিক যাই হোক স্বধর্ম রক্ষা, তার বিস্তারে সন্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং স্বীয় গোষ্ঠীর কল্যাণে লৌহ কঠিন ঐক্য ও আত্মত্যাগ প্রতিপক্ষদের অনুকরণীয় নিঃসন্দেহে। এই সাম্য খুব গৌরবের না হলেও জাগতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তার প্রয়োজনীয়তার দিকে স্বামীজীর অঙ্গুলী নির্দেশ। এই নির্দেশ বেদান্ত অনুসারী হিন্দুর প্রতি। বেদান্তের উদার ও প্রকৃত সাম্যতত্ত্বে এই ব্যবহারিক ঐক্য বা সাম্য নেই সত্য, কিন্তু তা সনাতন ধর্মের মহান উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে স্বাভাবিক জাতি বা শ্রেণী বিভাগের জন্য। হিন্দুর জাতি বিভাগ কুমড়োর উপরিভাগের মত বিভক্ত যার অন্তঃস্থলে সাম্য বিদ্যমান। ঠিক বিপরীতে অহিন্দু তত্ত্বে শশার মতো উপরে সাম্য কিন্তু অন্তরে বিভেদ। তথাকথিত হলেও সাম্যের কারণেই ইসলামের অগ্রগতি লক্ষণীয় আর হিন্দু তার অভাবে আজ এক ক্ষয়িষ্ণু জাতি।

এখানে স্মরণীয় যে বেদ-বেদান্তের সাম্যতত্ত্বই প্রাক-ইসলাম যুগের কয়েক হাজার বছর ধরে আরবে প্রচলিত থাকায় ইসলামেও তা মান্যতা পায়। তবে বেদান্তে যা অন্তরের বস্তু, ইসলামে তা বাইরের বৈশিষ্ট্যে পরিণত। “মুসলিম ইতিহাসের পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, বর্বরতার ঘটনা স্বামীজীর অজ্ঞাত ছিল”— রুদ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এ অতি সরলীকৃত সিদ্ধান্ত। “মুসলিমরা সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন” ও “এ অসুরজাত কোনওকালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই” স্বামীজীর এই মন্তব্যের পর তাঁর ইসলাম চরিত্রে অজ্ঞতার অনুমান অমূলক।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী।**

প্রথম শহীদ

স্বস্তিকার (৬/৮) সংখ্যায় দীনেশ সিংহমশায়ের “প্রথম শহীদ কে?” নামে সুলিখিত চমৎকার নিবন্ধটি পড়ে মনে পড়লো— বছর ২৫ পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায়, ‘স্বাধীনতা যজ্ঞে প্রথম আত্মদানকারী কে?’ মৎ লিখিত একটি প্রশ্নের উত্তরে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত মানুষ ও প্রাচীন বিপ্লবী কেউ ক্ষুদিরামকে, কেউ প্রফুল্ল চাকীকে প্রথম আত্মদান বা বলিদানকারীরূপে অভিমত দেন। আমার প্রশ্ন দীনেশ চন্দ্র সিংহের মতো সুপণ্ডিত গবেষক এঁদের মতো মহান দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মদানকারীকে ‘শহীদ’ অভিধা দিলেন কেন? ‘শহীদ’ হলেন ‘আল্লার হয়ে কে শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ ‘জেহাদে’ যে মৃত্যু বরণ করে তাকে বলা হয় ‘শহীদ’। ‘শহীদ’ শব্দটি আরবি ভাষার। কোরাণের পরিভাষায় ‘জিহাদ হি সবিঝিলাল্লা’ (আল্লার পথে যুদ্ধ), এই যুদ্ধকে—মহাভারতের ‘ধর্মযুদ্ধ’ বলা সমীচীন নয়। এ যুদ্ধ ‘বিধর্ম ও বিধর্মী নাশের যুদ্ধ।’ একেই বলা হয় ‘জেহাদ’। কলকাতার রায়ট (১৬। ৮। ১৯৪৬) ছিল মিঃ জিন্না ও সুরাবর্দির পরিকল্পিত ‘জেহাদ’। তাতে তিনদিনে ৬০০০ হিন্দু খুন ও ২০০০ হিন্দু নারীধর্ষণের জন্য বেরিলির সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১), রণজিৎ সিংকে ধ্বংস করার জন্য মুজাহিদ্‌বাহিনী নিয়ে ‘আক্রমণ করলে রণজিৎ সিং পুত্র শের সিং-এর কাছে পরাজিত ও মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি জেহাদে জয়ী হয়ে, ‘গাজী’ না হয়ে ‘শহীদের’ মর্যাদা পান। ‘ক্ষুদিরাম’ বা ‘প্রফুল্ল’-কেউই হিন্দু বা শিখ বধ করতে যাননি। তাঁদের অভীপ্সা— বিদেশী অত্যাচারী নিধন। কাজেই তাঁদের ‘শহীদ’ বলা ভুল। এই ভুলটাই অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিক ও রাজনীতিক অজ্ঞজনেরা চালিয়ে যাচ্ছেন। ‘শহীদ মিনার’ স্থলে— ‘মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিপ্লবী স্মারক স্তম্ভ’ হওয়াই সমীচীন। ঘৃণ্য নন্দলাল ব্যানার্জীকে গুলি করে মারেন বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর শিষ্য রণেন গাঙ্গুলী। আত্মোন্নতি সমিতির নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী— রড কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ করেন। এই মশার পিস্তল তাঁর দলের রণেন গাঙ্গুলিকে দিয়ে নির্দেশ দেন— ঘৃণ্য নন্দলালকে হত্যার। সারর্পেনটাইন লেনের এক দোতলা বাড়ির জানলা দিয়ে নন্দলালকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই লেখক তখন রিপন কলেজের ছাত্র। শুনেছেন, বিপিন গাঙ্গুলির মুখে।

—**প্রসিত রায়চৌধুরী, রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।**

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা

ভারতের প্রাচীনতম ভাষা হিসেবে সংস্কৃত পরিচিত। একসময় এদেশে সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহন করে সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সংস্কৃত ভাষাকে যথার্থ গুরুত্ব না দেওয়ায় বর্তমান সমাজে এখন তা কঠিন ভাষা হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। তবুও সংস্কৃত ভাষা এরাজ্যে ‘সংস্কৃত ভারতী’র মাধ্যমে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। তাই প্রতিবছরই এরাজ্যে ‘সংস্কৃত ভারতী’র উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি এ রাজ্যে এ জাতীয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বস্তিকার ৩০ জুলাই সংখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষাকে

সহজ ও সরলভাবে সহজে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যই এ জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে 'সংস্কৃত ভারতী'র পরিচালনায় এ জাতীয় শিবিরের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাছাড়া জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য ও সারল্য যাতে সাধারণের মধ্যে উৎসাহ জাগায় সেকারণে সারাদেশে আরও কিছু সংস্থার উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানাতে হয়। এদেশের বেদ-উপনিষদের মতো প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন সুবিদিত আছে। ভারতীয় নাটকেরও প্রাচীন ঐতিহ্য হলো সংস্কৃত নাটক। কালিদাস, ভাস, বিশাখ দত্ত, শূদ্রক ছিলেন প্রাচীন নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। আবার সংস্কৃত কবিতা ও কাব্য রচনায় ডঃ সীতানাথ আচার্যের অনন্য সাধারণ সৃষ্টি এ দেশের সমাজজীবনকে পরম্পরাগত সংস্কৃতিমনস্ক করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ জ্ঞানভাণ্ডার জনসমক্ষে উন্মোচিত হলে দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে। তাছাড়া সনাতন হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য বহন করে সংস্কৃত ভাষা। ভারতের বিভিন্ন মুনি, ঋষি, মহাপুরুষ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে স্কুলশিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। তবে টোলশিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবুও লজ্জার বিষয় যে এ রাজ্যে উর্দুভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও সংস্কৃত ভাষা সেভাবে সমাদৃত হয় না। কিন্তু ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও সারস্বত সাধনার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় করে দিতে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা উপলব্ধি করা দরকার।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলি।

ইনোসেন্স অব মুসলিমস্

'ইনোসেন্স অব মুসলিমস্' (Innocence of Muslims) একটি ছায়াছবি। ছবিটির নির্মাতা নাকুরা বা সেলি নাকুরা নামক এক মার্কিনী। ছবিটির প্রতিপাদ্য বিষয় : মহম্মদকে অসম্মান। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে— মহম্মদ ক্ষমতালোলুপ, নারীলোলুপ, এমনকী শিশু-সঙ্গলোলুপ। মুসলিম সমাজ ও বিশ্ব-সেকুলারবাদী (ইসলামপন্থীরা বা তোষক)-দের দৃষ্টিতে নাকুরা কট্টর ইসলামবিরোধী। ছবিটি ইউটিউবে উঠতে না উঠতেই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় জ্বলে উঠল আগুন। তবে শুরুটা লিবিয়ায় (বেনগাজি)। ১১ সেপ্টেম্বর রাতে বেনগাজিস্থ মার্কিন দূতাবাসে এক দল সশস্ত্র মার্কিনবিরোধী মুসলিম হামলা চালায়। সেই হামলায় নিহত হন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেন্স। দূতাবাসের সামনের অংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওঠে মার্কিন বিরোধী স্লোগান। লিবিয়ার পর আগুন জ্বলেছে মিশর, সুদান, তিউনিশিয়া, ইরাক, অস্ট্রেলিয়া, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ মোট কুড়িটি দেশে। হয়তো আরও আগুন জ্বলবে। সর্বত্রই লক্ষ্যস্থল মার্কিন দূতাবাস। কোথাওবা শুধু মার্কিন দূতাবাস নয়, হামলা হয়েছে বৃটিশ ও জার্মান দূতাবাসেও। মার্কিন বিরোধী এই জিঘাংসায় হতাহতের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। স্বভাবতই বিশ্বজুড়ে উঠেছে ইসলামের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ধিক্কার। তবে বিভিন্ন দেশের কার্টুনিস্টরা এই বর্বরতার প্রতিবাদ করেছেন কার্টুন এঁকে। কিন্তু কার্টুনগুলো আঁকা হয়েছে আগুন নেভাতে নয়, বরং আরও আগুন জ্বালাতে। যাকে বলে 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'। আগুন জ্বলার মধ্যেই ১৬ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত বৃটিশ কার্টুনিস্ট মার্টিন রোশন এক বৃটিশ সংবাদপত্রে এঁকেছেন একটি কার্টুন। কার্টুনটি এরূপ : কমলা বর্ণের ক্যানভাসে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। একপাশে রাখা ছোট একটি পেট্রোল-ক্যানের গায়ে লেখা 'ইনোসেন্স অব মুসলিমস'। আর ছবিটির উপরে লেখা : Whoa! What's their bleedin' problem? ব্যঙ্গচিত্রটির ইঙ্গিত স্পষ্ট। ওদিকে আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ফ্রান্সের আর এক কার্টুনিস্ট একটি পত্রিকায় এঁকেছেন মহম্মদের উলঙ্গ ছবি। উপরে লেখা একটি শব্দ : INTOUCHABLES. স্বভাবতই ইঙ্গিত— মুসলিমদের ও তাদের মহম্মদের দিকে। তবে মহম্মদকে নিয়ে কার্টুন এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও মহম্মদকে নিয়ে বহু কার্টুন আঁকা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ফলে দেশে দেশে মৌলবাদী মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে। তবুও মহম্মদকে নিয়ে কার্টুন আঁকায় খামতি পড়েনি। এটা নিঃসন্দেহে 'Tit for tat.' তবে কার্টুনিস্টরা তাঁদের কার্টুনের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন— মুসলিম তোষণ বন্ধ হোক। তারা কেন এত স্পর্শকাতর? অন্য দেশের বাক্-স্বাধীনতায় তাদের আপত্তি কেন? কেন, তাদের জঘন্য অসহিষ্ণুতাকে পাত্তা দেওয়া হচ্ছে? আসলে এ হচ্ছে, ''রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।''

ষাটের দশকে কাশ্মীরে হঠাৎ ঘোষিত হয়— হজরতবাল মসজিদে রাখা হজরতবাল (মহম্মদের চুল) চুরি গেছে। অমনি এই ঘোষণায় পাক-ভারত উপমহাদেশে জ্বলে ওঠে দাঙ্গার আগুন। পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৌলবাদী মুসলিমরা। দাঙ্গায় হতাহত হয় বহু হিন্দু। লুণ্ঠিত হয় হিন্দু বাড়ি, জ্বালিয়ে দেওয়া ঘরবাড়ি, হিন্দু মহিলারা হন ধর্ষিতা। এদেশের কোথাও কোথাও ঘটে অনুরূপ ঘটনা। পরে তদন্তে জানা যায়, হজরতবাল চুরি যায়নি, দাঙ্গা বাঁধাবার উদ্দেশ্যে এটা একটা রটনা। অথচ সেই রটনা ঘটায় বহু হিন্দুর সর্বনাশ। এদেশে মুসলিম শাসক ও আক্রমণকারীরা শুধু লুণ্ঠনই চালায়নি, করেছে নির্বিচারে অমুসলিম হত্যা, নারীধর্ষণ, বলপূর্বক নারীদের বিয়ে ও ধর্মান্তরকরণ। ২৬/১১ কাণ্ড (বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস) শুধু আমেরিকাবাসীদেরই নয়, ইউরোপীয়দেরও অস্মিতাকে করেছে আঘাত। আর এসবই মুসলিমদের পরমত-অসহিষ্ণুতার প্রমাণ। যীশুকে নিয়েও আপত্তিকর ছবি হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী গ্রন্থ অভিযোগ তুলে এক শ্রেণীর ধর্মোন্মাদ রাশিয়ায় ভগবদ্‌গীতাকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিল। কিন্তু খৃস্টান বা হিন্দুরা দাঙ্গা বাঁধায়নি, আগুন জ্বালেনি কোনও দেশে। হয়েছে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। মুসলিমরা যতদিন খৃস্টান বিরোধিতায় অটল থাকবে, ইসলামিক বিশ্বগঠনের জেহাদে মত্ত থাকবে, বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস চালাবে ততদিন মহম্মদকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হবে, কোরান পোড়ানোর মহোৎসব চলবে। তবে ইসলামের পতন যদি কোনওদিন ঘটে তাহলে তা ঘটবে খৃস্টানদের হাতে। তাই মুসলিমদের ইসলামের অবমাননা রুখতে হবে অহিংস পথে।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

হোতুর গ্রামের পুজো

ছেলেবেলার সঙ্গে এখনকার ছবি মেলাতে না পারলেও প্রতিবছরই গ্রামেই পুজোর কটা দিন কাটায় হোতু। ওদের বাড়িতে পুজো হয় ঘটে পটে। গ্রামের বটতলায় হয় সর্বজনীন পুজো। অনেকবছর ধরে হয়ে আসছে। হোতুর স্পষ্ট মনে আছে খুব ছোটোবেলায় প্রতিমা তৈরি দেখা। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বটতলা। সামনেই গ্রামের পাঠাগারের দোতলাবাড়ি। একপাশে খড়ের চালা। সেখানে ঠাকুর গড়তে আসত বিভূতি পাল। অনেক দূরের গ্রামে তার বাড়ি। সঙ্গে থাকত আরও দুতিনজন। জন্মাষ্টমীর দিন নদীর ধার থেকে মাটি আনা হোত। ঢাক বাজিয়ে দল বেঁধে যাওয়া। মাটি নিয়ে ফেরা। এরপর বিভূতি একদিন এসে প্রতিমার কাঠামো তৈরি করত। খড় দিয়ে বেঁধে একটা আদল দিয়ে চলে যেত। তারপর একদিন এসে মাটি তৈরি করে খড়ের উপরে চাপাত। অনেকগুলো প্রতিমা। লক্ষ্মী প্রতিমা শুধু দুটো। প্রথম দফার মাটির কাজ হয়ে যাওয়ার পরে রোদে শুকোত। তারপর এসে আবার মাটি লাগাত। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর মুখের ছাঁচ থাকত। সে ছাঁচ নাকি বিভূতির ঠাকুর্দার তৈরি। থাকে সারাবছর বিষ্ণুপদ দে-র বাড়ি। ছাঁচের কাজ হয়ে গেলে আবার ফেরত যায় দে-বাড়িতে। ঠাকুর গড়ার কাজ যারা করে তাদের শহরে বলে মৃৎশিল্পী। গাঁয়ের লোকেরা বলে মিস্ত্রি। ওই মিস্ত্রিদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয় দে-বাড়িতে। থাকে লাইব্রেরিতে। হোতুরা দুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দাঁড়িয়ে দেখত কাজ। অবাক হয়ে যেত। বাড়িতে গিয়ে মা-কে বলত। হোতু এখন আর গ্রামের প্রতিমা তৈরি দেখতে পায় না। মনের মধ্যে পুরনো ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে মাঝেমধ্যে।

প্রতিবছর কুমোরটুলিতে প্রতিমাগড়ার কাজ দেখে। সেখানে বড় মাপে আয়োজন, কত ব্যস্ততা, কত নামী শিল্পী কাজ করে। হোতুর মনে ছেলেবেলায় গ্রামে ঠাকুর তৈরির স্মৃতি এত গভীর হয়ে রয়েছে, সেখানে শহরের মৃৎশিল্পীদের কাজ ভালো লাগলেও মন জয় করতে পারে না। শহরে শারদ-উৎসব কেমন হয় ছেলেবেলায় জানা ছিল না। পরে জেনেছে। কিন্তু কোনবারেই পুজোয় শহরে থাকেনি। সপ্তমীর দিন গ্রামে চলে যায়। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত গ্রামে কাটিয়ে ফেরে শহরে। ওইসময়ে গ্রামে অনেকেই হাজির হয়। হোতুদের বাড়িতে লোকজন অনেক থাকে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বাড়ির ছেলেদের বন্ধুবান্ধবরা গ্রামের পুজো দেখতে হাজির হয়। গত বছর হোতুর ভাইপো অপুর সঙ্গে গিয়েছিল তার দুজন আমেরিকান বন্ধু। ধুতি পাঞ্জাবি, পাজামা পাঞ্জাবি পরে একেবারে মেতে গিয়েছিল। প্রচুর ছবি তোলে। তা প্রিন্ট করে অ্যালবামে সাজিয়ে উপহার দিয়েছিল অপুর মাকে। সেসব ছবি দেখেছে হোতু। অনেক ছবি। তার মধ্যে নিজের ছবিও দেখেছে। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, আমাদের গ্রাম এত সুন্দর! গ্রামের উৎসব এত বর্ণময়! ভাইপো অপু ভালো ছবি তোলে ঠিকই, তবে অন্য দেশের দুজন প্রথম এসে যেভাবে দেখেছে তার গুরুত্ব অনেকটাই।

বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে দরজার মাথায় বা পাশে পিসিমা গিরিমাটি গুলে লিখত 'এসো মা দুর্গা'। এখন আর লেখা হয় না। গোলার দরজার উপর এখনও পিসিমার লেখা আছে। পিসিমা মারা যাওয়ার পর প্রায় চল্লিশ বছর কাটল। গ্রামের পুজোর ভার যাদের উপর ছিল তারা খুব শ্রদ্ধা করত পিসিমাকে। হোতুর ঠাকুর্দার আমল থেকে গ্রামের দুর্গাপুজোয় কি কি দেওয়া হবে সব ঠিক করত পিসিমা। পিসিমার বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। বিয়ের কিছুদিন বাদে বিধবা হয়। বাবার বাড়ি ফিরে আসে। তারপর হোতুর ঠাকুর্দা সংসারের সব দায়িত্ব মেয়ের উপর ছেড়ে দেন। হোতুর বাবা কাকা জ্যাঠারা সব মেনে নেয়। পিসিমার নজর থাকত সবদিকে। প্রতিবছর পুজোর সময় মনে পড়ে পিসিমার কথা।

অপু বন্ধুদের তোলা একটা ছবি থেকে দুর্গার মুখ বড় করে প্রিন্ট করে হোতুদের বসার ঘরে রাখার জন্যে পাঠিয়েছে। হোতুর সঙ্গে কোতু গ্রামে আসবে ঠিক করেছিল। হোতু প্রথমে রাজি থাকলেও পরে ভেবেচিন্তে দেখেছে কোতুকে শহরে ধমকে-ধামকে সামলে রাখা গেলেও গ্রামে সেটা সম্ভব নয়। কে নজরদারি করবে! শিট্টু ছুটিতে যাবে তার গ্রামের বাড়ি বাঁকুড়ায়। চিকলি থাকবে হোতুর সঙ্গে। সে হোতুদের গ্রামে অনেকবার এসেছে। সকলের সঙ্গে তার ভালো জানাশোনা। বাড়ির অনেক কাজ করে হাসিমুখে। সেজন্যে হোতু পুজোর পাওনা ছাড়াও বাড়তি কিছু দেয়। শুধু বলে 'চিকলি, বিজয়ার দিন আনন্দটা একটু সামলে করিস।' চিকলি লজ্জা পেয়ে জবাব দেয়, 'নানা, ওরকম আর হবে না।'

হেসে ফেলে হোতু।

কৌশিক গুহ

টাটকা-গড়া পুজোর ছড়া ।। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

লক্ষ্মী-সুরো হিসেবি পুরো

শিব বললেন, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে
দুর্গা, এবার পুজোয় সবার বন্ধ যাওয়া বঙ্গে!
বঙ্গদেশের অঙ্গ জুড়ে এখন বেজায় রঙ্গ
গিয়েই দেখো, সিওর সবার হবেই আশাভঙ্গ!

দিনদুপুরেও এখন সেথায় মারছে মশা লেঙ্গু
লেঙ্গু খেয়েই হচ্ছে সবার ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গু!
পট-পটা-পট, ফট-ফটা-ফট তুলছে পটল সকলে
তোমার বাপের বাড়ি এখন নানান রোগের দখলে!

নিত্যনতুন নাম-না-জানা অজানা জ্বর বীভৎস
গন্‌শা-কেতো, জবাব দে-তো, যাবি নাকি? কী বৎস?
ভাইরাল ফিভার, স্পাইরাল ফিভার, অ্যাংরি এন্‌কেফেলাইটিস্‌
লক্ষ্মী-সুরো, বল্‌ তো পুরো, কিসের হিসেব মেলাইছিস?

লক্ষ্মী বলে, ঝক্কি মিছেই, লাভ নেই ড্যাড্‌ রিস্কে
তোমার কথাই মেলাচ্ছিলাম দুই বোন হার্ড-ডিস্কে!
ঠিক বলেছো, সত্যি নানান ঝুট-ঝামেলা বঙ্গে
মর্গে নেভার, স্বর্গে এবার থাকবো তোমার সঙ্গে!

অঙ্কন : রমাপ্রসাদ দত্ত

গন্‌শা-কাতু খেয়েই ছাতু

গন্‌শা-কাতু খেয়েই ছাতু বললে, শোনো বাবা
মর্ত্যে মিছেই মরতে যাবো, নইকো অতোই হাবা!
মা-কে তুমি বুঝিয়ে বলো, মা যেন যান্‌ একা
ভক্তেরা সব ব'সে আছেন, আসুন দিয়েই দেখা!

মর্ত্যে এখন সবসময়েই চলছে লম্ফঝম্প
যখন-তখন জঙ্গিহানায় থরহরি কম্প!
যুদ্ধ-লড়াই-দাঙ্গা-আগুন, অবাধ বোমাবর্ষণ
হচ্ছে রোজই, দেখতে পাবে খুললে দূরদর্শন!

হরেকরকম ঝুটঝামেলায় ভুগছে ভীষণ দুর্ভোগ
তার উপরে করছে কাহিল রোজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ!
বন্যা-খরা-ভূমিকম্প, টর্নেডো-টাফ্‌ টাইফুন
মাঝেমাঝেই হচ্ছে কত মা-বাবা-বোন-ভাই খুন!

হাসে হ্যারিকেন, পাশে সাইক্লোন, নাচে ক্যাটরিন-সুনামি
'সুনাম' কিসের? পাই না খুঁজে ওদের কোনই গুণ আমি!
স্বর্গে কোনও ঝঞ্ঝাটই নেই, নেই ঝামেলা-ঝক্কিও
"কেউ যাবো না" উঠল ব'লেই সরস্বতী, লক্ষ্মীও!

স্বাক্ষর : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

অঙ্গনা

পুজোয় নারীর সাজসজ্জা

মিতা রায়

চকমেলানো ঠাকুর দালান। ধূপধুনোর গন্ধে ঢাকির বাদ্যে মা দুর্গার আরতি করছেন ঠাকুরমশাই। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

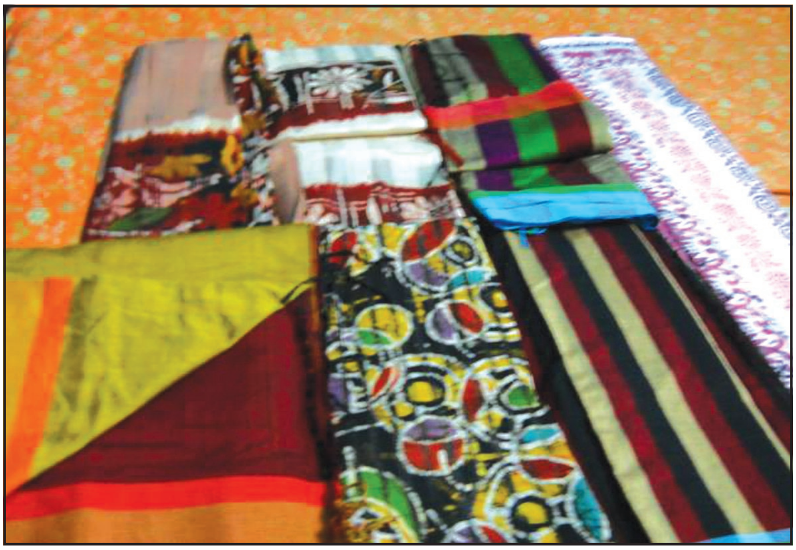

ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত বাড়ির সদস্যরা। মায়ের পুজোর আয়োজনের কাছাকাছি বাড়ির মহিলারা— বাংলার তাঁতের শাড়ি, গা-ভরা সোনার গহনা, নাকে নথে সুবেশা তাঁরা। হ্যাঁ বনেদিবাড়ির পুজোর সময়ে মহিলাদের সাজগোছের একটা স্ন্যাপ।

পুজোর আগে আপামর বাঙালির জীবনে আসে এক অনাবিল আনন্দ। যে আনন্দ শরতের নীলাকাশের মতো সারাবছরের কালো দিকগুলোকে আবরিত ক'রে এক আনন্দে ভরিয়ে দেয়। এই উৎসবে সবাই মাতোয়ারা হয়ে ওঠে; তবে নারী তো সুন্দরের প্রকাশ। তাই প্রতিটি নারী, ছোট বড় সকলেই তাদের সাজসজ্জা পোশাক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এ সময়ে।

বাঙালি ললনা শাড়ি পরিহিতা এটাই নারীর বিশেষত্ব। নারীর বসন শাড়ি আর অলঙ্কার তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পুরনো দিনে, পুজোর দিনগুলিতে মহিলাদের সাজসজ্জায় প্রধানত দেখা যেত শাড়ি, বিশেষত টাঙ্গাইল, ঢাকাই শাড়ির কদর ছিল। সোনার গয়নায় নিজেদের সাজিয়ে তোলা আর তার সঙ্গে কেশবিন্যাসে খোঁপা মহিলাদের সুন্দর করে তুলত। আর বেনে পরিবারের গৃহবধূদের নাকে নথ তাদের সাজের বিশেষত্ব এবং সেই নথ মহিলাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত।

মোটামুটিভাবে তৎকালীন সময়ের সম্ভ্রান্ত পরিবার বিশেষত ঠাকুর পরিবারে পুজোর সময়ে মহিলাদের সাজগোজ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো—

কুন্তলে বেষ্টেন স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তমালিকা,

সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর—চরণ রঞ্জিব অলক্ত-কঙ্কনে।

এইসব নারীদের সাজসজ্জায় কোনও চোখ ধাঁধানো সাজ ছিল না। অথচ, দৃষ্টিকাড়া এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য বিরাজ করত, যা সহজেই সকলকে মুগ্ধ করত। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সাজসজ্জায় ছিল ভিন্‌দেশের ছোঁয়া। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীদেবী, যিনি মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে আধুনিকতা এনেছিলেন, তাঁদের শাড়ি পরায় ছিল বোম্বাই দস্তুরি। এ প্রথায় ছিল কিছুটা বাঙালিয়ানা আর কিছুটা গুজরাটি ধরন। পরের দিকে অবশ্য এই শাড়ি পরার রীতি বদলে যায়। গলায় মাফ্ চেন, বড় মুক্তোরমালা ছিল গয়না আর কানে টপ। বেশি জাঁকজমক পছন্দ করতেন না তাঁরা।

যুগে যুগে বদল ঘটেছে সাজসজ্জায়। পুজোর সাজের আভিজাত্যে ক্রমে ক্রমে এল আধুনিকতার ছোঁয়া। ইদানিংকালে তো মেয়েদের শাড়ি পরার রেওয়াজ উঠে গেছে। ভারতীয় সাজের জায়গায় এখন পাশ্চাত্যের ছোঁয়া। বর্তমান দিনে মেয়েদের পোশাক হলো ঘাগরা, চোলি, ও মেখলার মতোই বিদেশী মিনি স্কার্ট, জিনস্ ও বারমুডা। স্লিভলেস টপ আর মিনি স্কার্ট বাঙালি তনয়াদের অঙ্গে দেখা যায়।

শাড়ি পরিহিতা মহিলাদের পরনে এখন তাঁতের শাড়ির পরিবর্তে ইমিটেশন সিল্ক, দক্ষিণ ভারতীয় শাড়ি বা ভিনরাজ্যের শাড়ি, তসর ইত্যাদি। পোশাকে 'মিনি' ব্যাপারটা এখন বেশি চোখে পড়ে, এক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার একটা প্রবণতা। শারদীয়া পুজোর চারদিন মহিলাদের শাড়িতেই বেশি মানায়। এটা ঠিক, যে যত নানারকমের পোশাক পরুক না কেন; শাড়িতেই তাদের সৌন্দর্য সব থেকে ফুটে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে গতির যুগে আঁটোসাঁটো পোশাকে অনেক সাবলীল থাকা যায়, প্যান্ট-শার্ট সেক্ষেত্রে মাননসই। কিন্তু পুজোর কাছে এসব পোশাক নারীর শোভা ম্লান করে। তবে শিল্পকর্মের নতুনত্বের অর্থাৎ ভারতীয় শিল্প, লোক শিল্প এখন বিভিন্ন কাপড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। সেগুলো ডিসপ্লে করায় সাজের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আসে ঠিকই। ভিনরাজ্যের ভিন পোশাক কখনই খারাপ নয়; তবে সেসব পোশাক মানানসই তাদের নিজস্ব পরিবেশে। বাংলার নারীদের অঙ্গে শাড়িই একমাত্র মানানসই এবং এটা তাদের নিজস্বতা। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় ফ্যাশন জগতে বৈচিত্র্য আসবেই; পোশাকেও পরিবর্তন আসবে। কিন্তু শালীনতা আর নিজস্বতা বজায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাটাই শ্রেয়।

পুজোর পাঁচালী

কৃষ্ণকলি মুখার্জী

ঢাকের পিঠে কাঠি পড়তে বাকি আর কয়েকটি দিন। তাই শুরু হয়ে গেছে আকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষার দিন গোণা। আকাশে বাতাসের পরতে পরতে মিলে আছে আগমনীর গন্ধ। গড়িয়াহাট থেকে হাতিবাগান, দমদম থেকে বড়বাজার সর্বত্রই এখন শুধু পুজোর কেনাকাটার ধুম। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের প্রধানতম পার্বণ হলো এই দুর্গোৎসব। সেরা পুজোয় বাঙালি চায় সেরার সেরা হয়ে উঠতে। সমাজের ওপর এই উৎসবের ভূমিকাও এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলে। বহু ব্যবসার উৎপত্তি হয় শুধু পুজোর এই চারটি দিনকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে এই দুর্গোৎসবের মূল স্তম্ভ বঙ্গীয় শিল্প সমাজ। কারণ এখন সর্বত্রই থিম পুজোর জয়জয়কার। আর থিম নির্ভর পুজো মানেই এক অভিনব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এই অভিনব চিন্তাধারাকে বাস্তবরূপ প্রদান করতে আমাদের শিল্পী সমাজের সক্রিয় ভূমিকা একান্ত লক্ষণীয়। এইসব কিছুর উর্ধ্বে থাকে পুজোর ফ্যাশন, পুজোর খাওয়া-দাওয়া আর অনাবিল আনন্দস্রোতের জোয়ারে অচিরে গা ভাসানো। পুজোর ফ্যাশন বললেই প্রথমে মনে পড়ে পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশন, আর পোষাকের প্রথম তালিকাতেই নারীদের জন্য থাকে বাহারি শাড়ী এবং পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবির ফ্যাশন। চিরাচরিত সাবেকি শাড়ী, সিল্ক, মসলিন, তাঁত প্রভৃতির পাশে এই পুজোর জোরালো আলোড়িত ফ্যাশন হলো বাহাশাড়ী। একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিকের নায়িকার নামে নামাঙ্কিত এই শাড়ী এবারের পুজোর বাজার মাত করতে নিয়ে এসেছে অনবদ্য সব কালেকশন। জুটের ওপর এপলিকের কাজ করা শাড়ীও এই বছরের পুজোর পছন্দের অন্যতম। আর মেখলা, জারদৌসী সালোয়ারকামিজ, রংবেরঙের কলমকারির কুর্তিও নারীর সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে প্রস্তুত। পুরুষরাও ফ্যাশনের এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। তাঁতের ওপর ঢাকাই কাজের পাঞ্জাবি, সিল্কের ওপর কলমকারি পাঞ্জাবি তাদের অন্যতম পছন্দ। শাড়ীর পরেই আসছে

গয়না। এইবার অলংকারের বাজার কাঁপাচ্ছে কাঠের ওপর খোদাই করা রঙীন নক্সাখচিত গয়না। সঙ্গে রয়েছে মোটা বেড়ের মানানসই টারসেল। সোনার দুর্মূল্যের অপ্রত্যাশিত চাহিদাকে ভোলাতে লেনি, শ্রীনি প্রভৃতি সংস্থাও বিপুল সম্ভারে নিজেদের সাজিয়েছে। এছাড়াও অক্সিডাইজ প্রভৃতি জাঙ্ক জুয়েলারিও বর্তমান। অলঙ্কারের পর আসে বাহারি ব্যাগ আর তারপরেই জুতোর ফ্যাশন। মানানসই ব্যাগ এবং জুতো না হলে বাঙালীর সাজশয্যা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না। এই পুজোর বিশেষ লক্ষ্য একরঙা কাপড়ের ব্যাগ কিংবা বিভিন্ন রঙের কাপড়ের এবং জরির সংমিশ্রণে তৈরি ব্যাগ। আর জুতোর ফ্যাশন জুড়ে আছে পেনসিল হিল, প্ল্যাটফর্ম হিলে এবং স্ট্র্যাপ শূ-এর অনবদ্য সংগ্রহ। জুতোর দোকানের লম্বা লাইন প্রমাণ করে হরেকরকম জুতোর চাহিদার কদর কতটা! ঘড়িও ফ্যাশনকে সম্পূর্ণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সেইজন্যই টাইটেন, সোনাটা, টাইমেক্স প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থার পাশাপাশি ধর্মতলা চত্বরের ওলি-গলির অদামী ঘড়ির দোকানে কিংবা স্টলেও পুজোর জন্য ঘড়ির হরেকরকম স্টক চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে পুজোর বাজার জমজমাট। প্রসাধন সামগ্রীও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন রকম মানানসই লিপস্টিক, নেলপালিশ, কমপ্যাক্ট মেকআপ-এর লাস্ট টাচ্‌কে সমৃদ্ধ করতে প্রস্তুত। পুজো তো শুধু নিজেকে কিংবা নিজের পরিবারকে সাজানোই নয়, নিজের বাড়ি ঘরকেও একটু অভিন্ন মাত্রায় সাজানো। তাই বড়ো বড়ো দোকানের পাশপাশি হকার্স কর্ণারগুলিও বেডকভার, বেডশিট, পর্দারকাপড় গৃহসজ্জার নানান সজ্জা সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়েছে। গলি থেকে রাজপথ সর্বত্রই লোকে লোকারণ্য। কালো মেঘের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে, ভ্যাপসা গরমে গলদঘর্ম হয়ে আইসক্রিমের শীতল চুম্বনের সঙ্গে অক্লান্ত শ্রান্ত চলনে দোকান দোকান ঘুরে কেনাকাটার জোয়ারে একমাত্র বাঙালিই পারে গা ভাসাতে। বহু প্রতীক্ষার পর আবার মা আসছেন আমাদের ঘরে। মায়ের আবাহনে মেতেছে বঙ্গ। পুজোর দিনগুলি আনন্দে হাসিতে ভরে উঠুক সেই কামনা করেই পুজোর পাঁচালী শেষ করছি।

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

নীরবতার অর্থ যখন ভীরুতা, আত্মতৃপ্তি আর বৌদ্ধিক অসততা

জয় দুবাসী

সেই অতি পুরোনো কহবৎটি হয়ত অনেকেরই মনে পড়বে যদি আমরা রাজকীয় শোভাযাত্রা দর্শনরত ছোট্ট ছেলেটির দিকে একবার তাকাই। হ্যাঁ, সেই তো শতাব্দী প্রাচীন প্রবাদে পরিণত হওয়া কথাটি আলটপকা বলে ফেলেছিল 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' কালের পরিহাসে ঠিক হুবহু একই দ্যোতনার কথাটি আমেরিকার এক স্বনামধন্য দৈনিকের দিল্লীর সংবাদদাতা আমাদের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী সংক্রান্ত প্রতিবেদনে আক্ষরিক অর্থেই উদ্ধৃত করেছেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ পরিধেয়হীন'। হায়রে মনমোহন! কোন দিকে তিনি দেখবেন হদিস করতে পারছেন না।

মনে রাখতে হবে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' কোনও এলেবেলে কাগজ নয়। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হওয়া এটিই একমাত্র সর্বমান্য দৈনিক যা আমেরিকান রাষ্ট্রপতিরা নিয়ম করে তাঁদের প্রভাতী চায়ের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন। খবরটি পাঠকালীন প্রেসিডেন্ট ওবামা নিশ্চয় মুচকি মুচকি হাসছেন। মনে রাখতে হবে এটিই সেই কাগজ যেখানে 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' ফাঁস হওয়ার জেরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ক্ষমতাবান নিক্সন সেই সাংবাদিকটিকে হয়ত সরিয়ে দিতে পারতেন কিংবা পত্রিকা সম্পাদকের ঘাড় মটকানোর কথাও হয়তো ভাবতে পারতেন। কিন্তু পারেননি। বাস্তবে তাঁকেই সরে যেতে হয়েছিল। সংবাদপত্রটি কালক্রমে আরও শক্তি বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রতিবেদনটি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ভীরুতা, অহেতুক আত্মতৃপ্তি ও 'বৌদ্ধিক অসততা'র (intellectual dishonesty) মতো অপমানজনক অভিধা দিয়েছে। কোনও একটি দেশে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এমন ধরনের বিশ্লেষণ অত্যন্ত কড়া। এক্ষেত্রে 'বৌদ্ধিক অসততার' মতো শব্দবন্ধটি ভাঙলে আদতে বেরোয় মিথ্যাচার করা। তাই সরাসরি এমন কথাটি একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। কিন্তু ভারতবাসী হিসেবে গত কয়েকমাস ধরে প্রতিনিয়তই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওই অনুচ্চারিত কথাটির সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি লোকসভায় হাজিরা দেন, তাঁর রায়সিনা হিলসের কার্যালয়েও বসেন, তবে উভয় স্থানেই 'অমিতাভ বুদ্ধ'-র গরিমায়। চর্তুদিক থেকে তাঁর জোটসঙ্গী দলের সদস্যদের কখনও বা তাঁর নিজের দলের লোকেদের সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর দুর্নীতির আরোপ আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে দিলেও তিনি মৌনীবাবাই থাকেন। সত্যিই তিনি কিছুই করেন না। যেমন দেখুন ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি উনি শোনেননি। কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি। হ্যাঁ ও ব্যাপারে শীলা দীক্ষিতকে ধরুন। কয়লার ময়লা? আরে না না, ওটা কয়লামন্ত্রী দেখছেন। সত্যিই তো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কিছুই দেখেন না, কিছু শোনেনও না। তাই তুমি কে হরিদাস আমার মতো সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সৎ প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার? বাস্তবে তিনি তাঁর নীরবতাকে উপভোগই করেন। মাঝে মধ্যে দু একটা অবান্তর শের-শায়েরী আওড়ান। পরিস্থিতিটা তিনি নিজের অনুকূলে এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছেন যাতে সকলে মনে করতে বাধ্য হয় তিনি ও তাঁর কার্যালয় প্রশ্ন-উত্তরের উর্ধ্বে বায়বীয় স্তরের। ইতিমধ্যে তাঁর যে সব সহকর্মী আখের ঘুচিয়ে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কারুর প্রতিবাদ থাকলে তাদের গিয়ে করুক। তিনি একেবারে ধবধবে সাদা, দাগহীন। কার এত হিম্মত তাঁর দিকে আঙুল তোলে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসী বা বিদেশীরা ঠিক তাঁর মতো করে ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখতে চাইছে না। ওয়াশিংটন পোস্টের সংবাদদাতা হ্যারি ট্রুমান শেষ বিচারে তাঁর দপ্তরকেই অভিযুক্ত করতে চাইছেন (the buck stops here)। প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই তা মানতে চাইছেন না। তিনি বলছেন এ দায়ী ও দায়ী, রাম হতে পারে শ্যাম হতে

> "তিনি লোকসভায় হাজিরা দেন, তাঁর রায়সিনা হিলসের কার্যালয়েও বসেন, তবে উভয় স্থানেই 'অমিতাভ বুদ্ধ'-র গরিমায়। চর্তুদিক থেকে তাঁর জোটসঙ্গী দলের সদস্যদের কখনও বা তাঁর নিজের দলের লোকেদের সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর দুর্নীতির আরোপ আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে দিলেও তিনি মৌনীবাবাই থাকেন। সত্যিই তিনি কিছুই করেন না।"

পারে কিন্তু কোনভাবেই নোংরা তাঁর টেবিলে নয়।

সরকারি প্রতিক্রিয়া :

এমন একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা কিরকম? দেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকে দীর্ঘকালীন রীতি অনুযায়ী সরকারের বিবেক বলে ধরা হয়। তিনি এমন বিশ্রী ব্যাপারটা উপযুক্ত কর্তাব্যক্তিদের কাছে সরকারি পর্যায়ে উত্থাপন করবেন এবং তারা যাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেদিকেও নজর দেবেন, এমন একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বরাবরই এই মহিলা বকাবকি বেশি করেন। কথা হচ্ছে ক্ষমা কে চাইবে? কাগজের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তাঁরা কোনও ক্ষমা-টমার গপ্পে নেই।

হ্যাঁ, সরকারের তরফ থেকে এই মর্মে কোন চিঠি-চাপাটি এলে তা তারা ছাপবে। তবে দিল্লীস্থিত সাংবাদিকও নয় আর কাগজ কর্তৃপক্ষ তো নয়ই— তাদের কেউই কোনওরকম দুঃখ প্রকাশ-ট্রকাশ করবে না। অবশ্যই আমাদের এই সম্মানীয় মহিলা তাঁর নানান সরকারি 'পর্দে কে পিছে' চ্যানেল দিয়ে হিলারী ক্লিন্টন অবধি প্রতিবাদপত্র নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীজী জানেন না বেচারী ক্লিন্টনের এ ব্যাপারে হাত-পা বাঁধা। কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি আলোচিত সংবাদপত্রটির নিয়ামকদের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন না কেননা আমেরিকায় এই ধরনের কাজকর্মকে দুর্বৃত্তগিরির পর্যায়ে ফেলা হয়। আমাদের এখানের মতো খবর অপছন্দ হয়েছে বলে আয়কর দপ্তরের লোকজনকে সংবাদপত্র মালিকের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিতেও তিনি পারবেন না। কিম্বা তাঁর দেশে আমাদের সি বি আই ধাঁচের যে সংস্থা বলবৎ আছে তাদেরকেও যথেচ্ছ মালিকের বিরুদ্ধে আমাদের এখানের মতো মর্জিমাফিক হঠাৎ করে লেলিয়ে দিতে পারবেন না। শুধু তাই নয় ভাবলে অবাক হতে হবে, কোনও মদের ককটেল পার্টিতে মালিকটির স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় কায়দা করে ব্যাপারটা তার স্বামীর কানে তোলার জন্য কোনও চেষ্টা এক ধরনের 'ভীতিপ্রদর্শন' বলেই গণ্য হবে। পরিণতিতে চাকরি খোয়াবেন বেচারা হিলারী। আমাদের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বুঝতেই পারছেন না এটা দু' দেশের সরকারের মধ্যে কোন দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নয়। ব্যাপারটা একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুত্ব। হায়রে! এক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর কীই বা করতে পারেন? বড় জোর আবার বুদ্ধের অন্য কোন ভঙ্গিমা অনুকরণ করে মৌনী থাকার চেষ্টা করতে পারেন বা গোটা ঘটনাক্রমটাই অকাতরে ভুলে যাওয়ার চেষ্টায় রত হতে পারেন।

অতীত উদাহরণ :

পেছন ফিরে প্রায় ৬০ বছর আগেকার অনেকটা একই রকমের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি তখন লন্ডনে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার স্বনামধন্য শ্রী কৃষ্ণ মেননের সহকারী ছিলাম। হঠাৎ লন্ডনের একটা কাগজে এত সরাসরি ও ব্যক্তিগত না হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সম্পর্কে আপত্তিজনক খবর ছাপা হয়। যথারীতি মেননকেই ব্যাপারটা সামাল দিতে বলা হলে তিনি ওই সাংবাদিককে একটি চা পানের আসরে ডাকেন। উদ্দেশ্য একটাই অপ্রিয় বিষয়টিকে জোড়াতালি দিয়ে ঠেকিয়ে দেওয়া। মনে পড়ে, দু' জনের প্লেটেই প্রচুর মাছের কাঁটা আর আলুর খোসা পড়ে থাকলেও (তাঁরা ফিস অ্যান্ড চিপস খাচ্ছিলেন) সাংবাদিকটি ১ ইঞ্চিও টলেননি।

আজকের দিন :

দেখে শুনে মনে হয় আমি প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতাম। যদিও এই পদত্যাগ ব্যাপারটা ডঃ সিং-এর বহুদিন আগেই করা উচিৎ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অবসর। তিনি কি জানেন না আজ তাঁর সুনাম ধুলোয় লুটিয়ে গেছে? তিনি হয়ে উঠেছেন চরম বিদ্রুপের পাত্র। ঠিক যেমন হয়েছিলেন রাজীব গান্ধী বোফর্স কেলেঙ্কারির পরে পরেই।

মনে পড়ে বিহারের গ্রামে গ্রামে চ্যাঙড়ারা ছুটে বেড়াত 'গলি গলিমে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়'। হতভাগ্য রাজীব মানুষকে বোঝাবার যথাসাধ্য কসরৎ করেও এই ধাক্কা কোনওদিনই সামলে উঠতে পারেননি। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজীবের হাতে তাস কিছু ছিল না। বোঝানোর ব্যাপারটাও তাই লোকে নেয়নি। এটা তো পরিষ্কার রাজীব বা তার অন্তরঙ্গ লোকজন সুইডেন থেকে টাকা নিয়েছিল। কেলেঙ্কারিতে তাঁর ভূমিকাটা লুকোনোর পরিসর তাই ছিল না। কিন্তু মনমোহন তো এসব কিছুর মধ্যে নেই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও চক্রের সঙ্গে জড়িত নন। এতগুলো কেলেঙ্কারি ঘটলেও তিনি কোনটা থেকেই ব্যক্তিসূত্রে লাভবান হননি।

কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয় না, হয় না সাতখুন মাফ। তিনি চোখ বুজে থেকে সায় দিয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কুকর্মে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঠিক তাঁর পাশেই নির্দিষ্ট মর্যাদার সামনে বসেন। তারা জাতীয় কোষাগার লুঠ করেছে আর, তাদের প্রতিহত করতে তিনি কিছুই করেননি। অবশ্য এমনটা বলাই যেতে পারে এই পদ্ধতিটাই চিরচরিত কংগ্রেসী গৃহীত ফরমুলা। তুমি আশপাশের লোককে দেশ লুঠতে অলিখিত অনুমতি দিয়ে উল্টো দিকে চেয়ে থাক। শোনা যায় কৃষ্ণ মেননের অধীন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অফিসারেরা দু' হাতে ঘুষ নিয়েছে। অনেকে বলে এর মধ্যে মেননজীও জড়িয়ে ছিলেন। এটা কি বিশ্বাস্য যে এতসব কুকীর্তি সম্বন্ধে নেহরু কিছু জানতেনই না। ঘটনা ঘটছিল তাঁরই বাড়ির পেছনের বাগানে। আর রাজধানীর কাগজগুলো মজে ছিল নিত্য নতুন কেলেঙ্কারির গপ্পে। সবই ঘটছিল তাঁর অগোচরে? অবিশ্বাস্য!

তবু তিনি কিছু করেননি। তিনি কৃষ্ণমেননকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি এসব কি শুনছি, কি ঘটছে? সত্যি কিছু ঘটে থাকলে মেনন কতটা ওয়াকিবহাল, আর কিই বা তিনি (মেনন) ভাবছেন। না, নেহেরু তাঁর অফিসে চুপ করে বসেছিলেন, ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অনুমিত ফলশ্রুতিতে চীনা আক্রমনের অভিঘাত ও পরাজয় কোনটাই তাঁকে নড়াতে পারেনি।

ঠিক যেমন নিত্যদিন একের পর এক কেলেঙ্কারির খবর হেডলাইন হয়ে বেরোলেও এক সময়ের অতি মানবীয় অর্থনীতিবিদ ও আমলা আজকের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অবিচল বসে চোখ পিটপিট করছেন। কোনও রাস্তা দেখাচ্ছেন না। সম্পূর্ণ জড়ীভূত।

এর পরও কি খবরের কাগজের সাংবাদিক সে দেশীই হোক বা বিদেশী যদি সারা পৃথিবীকে এই নিকম্মাগিরির কথা জানায় তাকে সত্যিই কি খুব দোষ দেওয়া যায়?

জন্মেজয়-বৈশম্পায়ন সংবাদ

অথঃ বুদ্ধিজীবী-সেকিউলার ইত্যাদি অর্থ বর্ণন

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

অতঃপর জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মুনিবর, ধৌম্য ঋষির মুখে শুনেছি কলিযুগে বুদ্ধিজীবী, প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী, সেকিউলার এই শব্দগুলি খুব শোনা যাবে। আমি এই শব্দগুলির অর্থ তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, তিনি মহাত্মা নারদের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সেজন্য খুব ব্যস্ত, নইলে তিনি এগুলির অর্থ বলে দিতেন। যা হোক, আপনি যদি শব্দগুলির অর্থ বা ব্যঞ্জনা একটু বর্ণনা করেন তবে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা খানিকটা কমে।

বৈশম্পায়ন বললেন, নৃপবর, তোমার পূর্বজ যুধিষ্ঠিরের মতো তোমারও অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা। যেমন খাণ্ডব বন দহন করেও অগ্নিদেবের ক্ষুধা মেটেনি তেমনি তোমাকে এত বিষয়ে বলেও তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা মেটেনি। অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা কুরুকুলের বৈশিষ্ট্য এবং এটি সভ্যসমাজের বাঁচার যন্ত্র। যে জাতির জ্ঞানতৃষ্ণা নেই সে মৃতবৎ। যাই হোক, আমি শব্দগুলির অর্থ বা ব্যঞ্জনা তোমাকে বলছি, তুমি শ্রবণ কর। কলিযুগে বঙ্গদেশে তথা ভারতভূমিতে বুদ্ধিজীবী নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। এরা প্রচণ্ড তার্কিক হবে, এদের কাঁধে একটা ঝোলা থাকবে, পায়ে চটি, চুল উস্কো-খুস্কো, কথা বলবে মেয়েলি সুরে ভেঙে ভেঙে। এদের বুদ্ধি সব সময় বিপরীতমুখী হবে। এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ওরা ছাড়া কেউই বুঝতে পারবে না। এরা হবে এক অন্ধ শক্তি, এদের কাজ ও কর্মের দ্বারা এরা স্বজাতি তথা স্বদেশকে ধ্বংস করতে তৎপর হবে। ইঁদুর এবং উই পোকা যেমন যে জায়গায় থাকে সে জায়গাটি কেটে তছনছ করে এরা তেমনি যে দেশ বা সমাজে থাকবে সেটি ধ্বংস করবে। হে কুরুপতি, মুসলমানদের মসজিদ চূর্ণ করে এরা হুলুস্থুলু বাঁধাবে। মুসলমানরা তাদের বিদ্যালয়ে কোরাণ, হাদিস ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থ পড়ানোর দাবী করলে এরা সেটি সমর্থন করবে, কিন্তু হিন্দুরা যদি বিদ্যালয়ে সংস্কৃতসহ হিন্দু শাস্ত্র পড়ানোর কথা তোলে এরা সেটিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে প্রবল আন্দোলন করবে। এবং সেই প্রচেষ্টা বানচাল করে তবে ছাড়বে।

মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করলে এরা তাতে সায় দেবে, কিন্তু হিন্দুরা যদি হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে উদ্যোগ নেয় এরা তার বাধা দেবে। আরও বলছি শ্রবণ কর। এক সময় গুজরাটে মুসলিমরা ঠাণ্ডা মাথায় একটি ট্রেনের কামরায় আগুন ধরিয়ে উনপঞ্চাশজন হিন্দু করসেবকদের পুড়িয়ে মারবে। এই বুদ্ধিজীবীরা এই জঘন্য কাজের নিন্দা করবে না। কিন্তু এই দুষ্কর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যখন হিন্দুরা গোধরা জেলায় কিছু মুসলিমদের হত্যা করবে তখন এরা দেশময় আন্দোলন শুরু করবে, করসেবকদের হত্যা করার প্রসঙ্গ তুলতে দেবে না। কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়নের ব্যাপারে এরা নিশ্চুপ থাকবে, কিন্তু অসম সীমান্তে বাংলাদেশী মুসলিমদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রুখে অসমিয়া ও বোরো জাতিরা রুখে দাঁড়ালে এরা ক্ষেপে আগুন হবে। এদের পাণ্ডা হবেন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু। আমি জ্ঞান চক্ষে দেখতে পাচ্ছি স্বাধীন ভারতে শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ জুম্মা মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদ পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হলে নেহরু সেই উদ্যোগকে সাদরে সমর্থন করবেন, কিন্তু একই সময়ে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল সোমনাথ্ মন্দির পুনর্নির্মাণে উৎসাহ দেখালে তিনি এটিকে

এদের পাণ্ডা হবেন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু। আমি জ্ঞান চক্ষে দেখতে পাচ্ছি স্বাধীন ভারতে শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ জুম্মা মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদ পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হলে নেহরু সেই উদ্যোগকে সাদরে সমর্থন করবেন, কিন্তু একই সময়ে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল সোমনাথ্ মন্দির পুনর্নির্মাণে উৎসাহ দেখালে তিনি এটিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেবেন।

সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেবেন। আশ্চর্য কী যে এঁর সাকরেদরা এই পথেই হাঁটবেন। আমি এও জ্ঞান চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এক সময় চীন দেশ ভারতের সীমান্তের বিপুল ভূখণ্ড অধিকার করবে। তখন দেশে প্রবল আন্দোলন হবে। এই বুদ্ধিজীবীরা দেশপ্রেমিকদের সমর্থন করা দূরে থাক চীনের পাশে প্রকাশ্যে দাঁড়াবে।

জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করলেন, হে মহাত্মন, এই বুদ্ধিজীবীরা কি ভারত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করবে, অন্য দেশে দেখা যাবে না?

বৈশম্পায়ন মৃদু হেসে বললেন, হে কুরুকুলরত্ন, সব দেশেই দেশশত্রু বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি আছে এবং থাকবে, কিন্তু সেসব দেশে জনমত এত বলিষ্ঠ, তাদের দেশপ্রেম, স্বধর্মপ্রীতি এতটাই গভীর যে এরা সংখ্যায় বাড়তে পারে না এবং জাতীয় দুর্দিনে কূটকচালি অবলীলাক্রমে এবং নিঃস্বার্থভাবে বিসর্জন দিয়ে স্বজাতি তথা স্বধর্মীয়দের পাশে দাঁড়ায়। এরা অনেকটা বরফের মতো, বিদেশী তথা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তাপ বৃদ্ধি পেলে এরা অদৃশ্য হয়ে মূল স্রোতে মিশে যায়।

জন্মেজয় সাগ্রহে বললেন, হে মহাত্মন, আপনি তো ত্রিকালদর্শী, কয়েকটি উদাহরণ দেবেন?

বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমি কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি শ্রবণ কর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা খৃস্টানদ্বেষী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার শপথ নেবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। সব আমেরিকাবাসী এজন্য ওবামাকে অভিনন্দন জানাবেন। আমাদের দেশে হলে বুদ্ধিজীবীরা রে রে করে ধেয়ে আসত এবং ভারতীয় ওবামাকে কাঁদিয়ে ছাড়ত। কিছুদিন বাদে একজন আমেরিকাবাসী *'ইনোসেন্স অফ মুসলিম'* নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে এই অজুহাতে মুসলমানেরা দেশে দেশে সেটির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, মার্কিন সহ অন্য খৃস্টান দেশের দূতাবাসগুলি আক্রমণ করবে এবং এক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করবে। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের এই কাজ সমর্থন করবে কিন্তু আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশগুলির বুদ্ধিজীবীরা এই চলচ্চিত্রকারের পাশে দাঁড়াবে, সে দেশের সরকারও মুসলমানদের আন্দোলনে এতটুকু বিচলিত হবে না। আরও শোনো--- ডেনমার্কে জনৈক কার্টুনিস্ট মহম্মদের কার্টুন এঁকেছেন এই অপরাধে এক মুসলমান তাঁকে হত্যা করবে। ওদেশের বুদ্ধিজীবীরা কার্টুনিস্টের কাজ সমর্থন করবে। এমন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা ঠিক উল্টোটাই করত। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমান লেখক সলমন রুশদি *'মিডনাইটস চিলড্রেন'* নামে একটি গ্রন্থ লিখে মুসলমানদের বিরাগভাজন হবেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চাপে ভারত সরকার রাতারাতি বইটি নিষিদ্ধ করে দেবেন, কিন্তু বৃটেন বা অন্য খৃস্টান দেশগুলি নিষিদ্ধ তো করবেই না উপরন্তু লেখককে নিরাপত্তা দেবে। ওদেশে বুদ্ধিজীবীরা সরকারের পাশেই থাকবে।

জন্মেজয় বললেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি এই ঘৃণ্য নরপশু স্বদেশ ও স্বজাতির শত্রু বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হলাম। আমি আর এতটুকু শুনতে চাই না। শরীরে নর্দমার নোংরা জল পড়লে যেমন গা ঘিন ঘিন করে এবং দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় আমারও তেমনি প্রসঙ্গান্তরে যেতে ইচ্ছা করছে। আপনি দয়া করে এবার প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী, সেকিউলার ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

বৈশম্পায়ন হেসে বললেন, মহারাজ, সেকিউলার শব্দটির অর্থ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্ম যাঁর কাছে সমান এবং যিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু এর গুহ্যার্থ হলো— যে ব্যক্তি হিন্দু ধর্মবিরোধী। সেকিউলার হলো বুদ্ধিজীবী শব্দের রকমফের। যে স্বধর্ম ও স্বজাতি প্রেমিক এদের কাজের বিরোধিতা করবে এরা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করবে।

জন্মেজয় কানে হাত দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, মুনিবর, আমি সব বুঝেছি আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। সুগায়ক যেমন তাল-লয়হীন গান সহ্য করতে পারে না, পরিস্কার ব্যক্তি যেমন অপরিষ্কার স্থানে এতটুকু সময় থাকতে ইচ্ছা করে না, ধার্মিক যেমন অধার্মিক আলোচনা শুনতে চায় না, আমি তেমনি এই নিকৃষ্ট সর্পের মতো ক্রূর, শৃগালের মতো ধূর্ত, মহিষের মতো পঙ্কে নিবদ্ধ, শকুনের মতো নিম্ন দিকে দৃষ্টিসম্পন্ন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সেকিউলারদের সম্বন্ধে এতটুকু আর শুনতে চাই না। আমি অন্য বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

গট-আপ গেম : ডিল কমপ্লিট

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর দিকে চোখ রাখলে বেশ কিছু অনুমান সত্যে পরিণত হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এফ ডি আই নিয়ে বঙ্গেশ্বরীর সাম্প্রতিক আচরণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো একটা নাটকের মঞ্চায়ন না হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঝাঁকের কৈ আবার ঝাঁকে ফিরে যাবার মতো অবস্থার করুণ পরিণতি ঘটে যেতে পারে না কি? একেই তো বলে রাজনীতির গট-আপ গেম। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলার চেষ্টা করাই ভালো।

ঘুমন্ত সিং থুড়ি মনমোহনের মোহিনী সংস্কার নামক বেলুনটি হাওয়ার অভাবে বেশ চুপসেই ছিল। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে আর বেশি দেরিও নেই, ফলে তাঁর জায়গার শূন্যস্থান পূরণের ঘোর দাবীদার যিনি, তাঁকে তো ঘটা করে রাইসিনা হিলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তাঁকে সমর্থন করা, না করা নিয়ে অনেক নাটক আমজনতা দেখলো। তারপর ডিল অনুযায়ী যা ঘটার তাই ঘটলো। এবারে যখন মঞ্চে এলো এফ ডি আই গোল বাঁধলো সেখানে। এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে বঙ্গেশ্বরী এ প্রসঙ্গে কিচ্ছুটি জানতেন না, কিন্তু তাঁকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, ফলত বামেদের পালের হাওয়া কাড়তে হলে এবং সেই সঙ্গে নির্বাচনী বৈতরণী সাফল্যের সঙ্গে পার হতে গেলে তাঁকে ময়দানে নামতে হবেই, কারণ এটা যে তাঁর বা মা-মাটি-মানুষের রাজনৈতিক মূলধন।

দিল্লীশ্বরীও বুঝতে পারলেন সে কথা। সিপিএমের পালের হাওয়া কাড়তে পারলে তারও যে লাভ এবং সেটা একমাত্র বঙ্গেশ্বরীর পক্ষেই সম্ভব। দিল্লীশ্বরীর নিজের দলের কাচ্চাবাচ্চারা তো স্নো-পাউডার মেখে সাদা পাঞ্জাবী পরে টিভিতে মুখ দেখাতেই ব্যস্ত, ফলে বঙ্গেশ্বরীর ওপর নির্ভর না করে উপায় বা কি?

তাছাড়া এটা তো ঠিক যে এফ ডি আইয়ের বিরোধিতা করা তার একটা পলিটিক্যাল কম্পালশান্, যেমন সেটা আনা মনমোহনীয় কমপালশান, কারণ ওদিকে ওবামার নির্বাচনও আসন্ন। সিং সাহেব বেশ

মনমোহন

ওবামা

বুঝতে পারছিলেন তাঁর বিদায় আসন্ন, মালাও প্রস্তুত, শুধু সময়ের অপেক্ষা, কারণ যুবরাজ যে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, অতঃ কিম্? একটাই রাস্তা খোলা, যাবার আগে একটা হেস্তনেস্ত করে দিয়ে যাই, ফল যা হবার হবে হোক। এরপর পেনশন বিল, বিমা বিল, ফরওয়ার্ড ট্রেডিং বিল, কোম্পানি বিল ইত্যাদি হাতে রইলো। অর্থাৎ যা হয় হোক, আমায় তো আর সেটার দায়দায়িত্ব নিতে হবে না। মুলায়ম-মায়াবতী কিছুতেই সমর্থন তুলতে পারবে না, সেটা আবার ওদের ব্যক্তিগত কম্পালশান্। সুতরাং এটাই সুবর্ণ সুযোগ। ওদিকে জয়ললিতা না হয় করুণানিধি হাতে তো আছেই। আবার নবীন পট্টনায়ক নীতিশ কুমার এমন কি শারদ পাওয়ারের দায়িত্বও বঙ্গেশ্বরীর ওপর ছেড়ে দিয়ে ওকে ওর মতো ঘুঁটি সাজাতে দেওয়া অনেক সহজ। বিনিময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে বাংলার কোনও প্রকল্পের কাজ যেন হঠাৎ টাকার অভাবে বন্ধ না হয়। সুতরাং কোনও প্যাকেজ বা সুদ কামানো এইসব রব আর তেমন ভাবে শোনা যাবে না। অর্থাৎ তুমি তোমার মতো কাজ করে যাও, আমি আমার মতো করে যাব, তোমার শুধু টাকা পেলেই কেল্লা ফতে। আমজনতা এখন দেখতে পাবে অনেক নাটক। চলবে চিৎকার, গলা ফাটানো, আন্দোলনের নামে গট-আপ গেমের ওয়ার্ম আপ। এর মধ্যে অবশ্য পঞ্চায়েত ভোট সেরে তার ফসল ঘরে তুলতে হবে। তারপর আসবে লোকসভা নির্বাচন। সেখানেই আসল খেলাটা হবে শুরু। প্রণববাবুর ছেলের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী দেওয়া হবে না, তা ইতিমধ্যেই ঘোষিত। পঞ্চায়েত ভোটেও তলায় তলায় অনেক জোটবন্ধন হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গেশ্বরী একটা ভালো সংখ্যা নিয়ে যদি ফিরে যেতে পারেন তবে আর তাঁকে পায় কে।

মায়াবতী, মুলায়ম, নীতিশ কুমার, করুণানিধি বা জয়ললিতা, ওদিকে নবীন, শারদ পাওয়ার--- এদের সমর্থনে যদি ইউপিএ (৩) আবার প্রতিষ্ঠা পায় তবে তো সোনায় সোহাগা।

বিজেপি এখনও কোমর বাঁধতে শুরুই করতে পারছে না, কারণ আদবানী না মোদী এ বিতর্ক এখনও থামেনি। ফলে একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়তো বা অপেক্ষা করে আছে। সেই সুযোগটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চালে কাজে লাগাতে হবেই। তবে এর মধ্যে যদি বিজেপি ঘরোয়া কোন্দল মিটিয়ে তেড়েফুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তবে অঙ্কটা একটু অন্যরকম হয়ে যেতে পারে, নচেৎ যথা পূর্বম্ তথা পরম্। বিজেপি-কে বাদ দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্টও সুদূর পরাহত। অতএব পরিস্থিতি বেশ কিছুটা জটিল সন্দেহ নেই।

এদিকে সমস্ত হম্বিতম্বি ক্ষোভ বিক্ষোভ সবই মনমোহনকেন্দ্রিক হয়েই থাকবে এবং সেটাই সাব্যস্ত হয়েই আছে। এটাই ডিল। অচিরেই আমরা তার কিছু ট্রেলার দেখতে পাবো। আর পিকচার?— আভি বাকি হ্যায় বস্। সুতরাং ঝাঁকের কৈ আবার ঝাঁকেই ফিরে যাবে,— 'নহি তো গব্বর সিং আ যায়গা'— এই ভয় তো সকলের আছেই। অতএব সাধু সাবধান!

(লেখক একজন আইনজীবী)

পরলোকে ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ডঃ অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং বঙ্গীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ-এর রাজ্য সভাপতি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩ অক্টোবর রাত ৯টা নাগাদ নৈহাটিতে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওইদিন সন্ধ্যার সময় একটু অস্বস্তি বোধ করলে চিকিৎসকদের ডাকা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি অনন্তলোকের পথে পাড়ি দেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ও জামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং সারা বাংলা জুড়ে বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে তিনি রেখে গেছেন। স্থানীয় মানুষজনের কাছে তিনি 'মাস্টারমশায়' হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, আমাদের কাছে অজিতদা। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে সকলেই হতবাক ও শোকাহত। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন এবং নিঃস্বার্থ সেবাভাব তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

১৯৪০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা কল্যাণীবালা দেবী। ছোটবেলায় বাবাকে হারান, দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ছাত্রজীবন কাটে। এর মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে অনার্স ও এম এ পাশ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষক এবং আংশিক সময়ের অধ্যাপকও ছিলেন। শিক্ষকতা করতে করতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রধান ড. হরিপদ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থটির নাম— 'বাংলা সাহিত্যে স্বপ্নতত্ত্ব ও অদৃষ্টবাদ'। ড. হরিপদ চক্রবর্তী তাঁর পিতৃতুল্য—একথা তিনি বহুবার বলেছেন।

বয়সকালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন এবং সঙ্ঘের আদর্শকেই নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। মৃত্যুর দু'দিন আগে ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কল্যাণভবনে বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের বৈঠকে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ও গল্পে মেতে ছিলেন। তখন কে জানতো আর মাত্র দু'দিন পরে তিনি ছবি হয়ে যাবেন। ১৯৯৪ সালে ওল্ড মালদায় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে তিনি সর্বাধিকারীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

তাঁর সভাপতিত্বে বাংলার শিক্ষাজগতে বঙ্গীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ একটি স্থান করে নিয়েছিল। সংগঠন পেয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃতি। সংগঠনের কাজে তিনি যেমন সময় দিয়েছেন, ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করতেও কসুর করেননি। তাঁরই তত্ত্বাবধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সঙ্ঘের প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্য- তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রবেশ। 'নেতাজী এসো ফিরে', 'গানের খেয়া' দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু। বাবা ছিলেন মা কালীর সাধক। তাই শক্তি সাধনার প্রতি তাঁর সহজাত আসক্তি ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে 'তন্ত্রে অভীষ্ট সিদ্ধি' বইটি প্রকাশিত হয়। 'মাতৃতন্ত্রের সাধনা ও ভাবনা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসও রচনা করেন।

তাঁর সব থেকে বড় পরিচয়— তিনি সকলের আপনজন। এমন একজন মানুষ-কে হারিয়ে তাই সবাই গভীর ব্যথিত। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chilli Powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

বিবাহের নিমন্ত্রণ

অদ্ভুত রকম

দেবতাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পড়ে শোনাচ্ছেন পূজারী সঞ্জয় দধীচ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশুপ্রেমীদের কাছে রণথম্ভোর ন্যাশনাল পার্ক একটি অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই অঞ্চলেই রয়েছে ত্রিনেত্র গণেশ মন্দির। পশুপ্রেমীদের মনে ভক্তিরস সঞ্চার করতে এই মন্দিরের অবদান নেহাত কম নয়। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণেশ যে অত্যন্ত জাগ্রত হবেন তা আর নতুন কী? বিশেষ করে মন্দিরটি যখন সহস্রাব্দ প্রাচীন। কিন্তু গণেশের পদতলে একগুচ্ছ বিবাহের আমন্ত্রণ পত্র দেখলে রীতিমতো ভিরমি খেতে হয়। এ আবার কি রে বাবা! গণেশ দেবতা কি এতই জাগ্রত যে তাকে প্রেম নিবেদন করতে হবে! বিয়ের কার্ডগুলো দেখলে ভুল ভেঙে যাবে। আরে এতো আমার আপনার মতো স্বয়ং গণেশকেও নিমন্ত্রণ করেছে বিয়েতে! গণেশ দেবতা এঁদের কাছে কতখানি জাগ্রত তা বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই। আর সেই বিয়ের কার্ডের কতই না বাহার। কোথাও সোনালী মোড়ক, কোথাও আবার গোলাপী ফিতেয় মোড়া। কোনটা আবার আর্ট পেপারে কারুকার্য করা, কোনওটা বা সাধারণ কাগজে। কোনওটার আবার বহু ভাঁজ কোনওটা নিতান্তই কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এরকম হরেক কিসিমের নিমন্ত্রণপত্র প্রতিদিনই আসে ত্রিনেত্র গণেশ মন্দিরে। মন্দিরে কোনও পূজারী, কোনও সেবায়েত বা কোনও কর্মচারীকে নয়, সরাসরি নিমন্ত্রণ পান ভগবান গণেশ। এহেন নিমন্ত্রণপত্রের বহর বোঝানোর জন্য কিছু তথ্য-পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যাক। গত এপ্রিলে, বিয়ের শেষ মরসুমের হিসেবে প্রতিদিন গড়ে ২০ কিলো নিমন্ত্রণপত্র এসেছে মন্দিরে। না কোনও মুদ্রণ প্রমাদ নেই। ঠিকই পড়ছেন গড়ে ২০ কিলো নিমন্ত্রণপত্র এসেছে শেষ বিয়ের মরসুমে। এই ট্রেন্ড বর্তমান বিয়ের মরসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চলে বলে জানা যাচ্ছে।

সঞ্জয় দধীচ, পাঁচপুরুষ ধরে এই মন্দিরে তাঁরা গণেশের সেবায় রত। তিনিও বলতে পারছেন না ঠিক কবে থেকে এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার চল শুরু হয়েছে। তবে মন্দিরে কান পাতলে শোনা যাবে একটি অসাধারণ কিংবদন্তী— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর বিবাহেই না কি প্রথম বিবাহের কার্ড পাঠানো হয় এই মন্দিরে। মন্দিরটি সুপ্রাচীন— এগারো শতকে তৈরি। তাই এধরনের কিংবদন্তী স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে এখানে। পাহাড়ের ওপরে রণথম্ভোর দুর্গের পাশে গোলাপী আভার মন্দিরটিকে দেখতে সত্যিই অপরূপ লাগে। তার পাশে টিনের শেডে দর্শনার্থীদের দীর্ঘ লাইন। শুধু বিয়ের কার্ড পাঠিয়েই ভক্তরা ক্ষান্ত থাকেন না, রহিস ভক্ত শুকনো ফল ও দক্ষিণাও পাঠিয়ে দেন 'শুভবিবাহে'র পর। পুরোহিত সঞ্জয় দধীচের বক্তব্য, "রাজস্থানের শেখাওয়াতি এলাকার মারওয়াড়ি সমাজের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়েতে গণেশকে নিমন্ত্রণ না করায় তাঁর বাহন ইঁদুরকুল বরযাত্রীদের যাওয়ার রাস্তা কেটে দেয়। মূলত এই বিশ্বাস থেকেই তাদের যে কোনও বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র সর্বাগ্রে এখানে পাঠান শেখাওয়াতি মারওয়াড়ি সমাজের মানুষজন।" বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর। তাই তর্ক না করে আপনার বিয়ের নেমন্তন্নটাও প্রথমে গণেশ বাবাজীকেই করুন।

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012

Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

যোগে রোগ মুক্তি

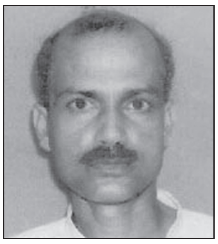

আশীষ পাল

প্রাণায়াম প্রক্রিয়া

(পূর্ব প্রকাশের পর)

চতুর্থ প্রক্রিয়া : অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম

পদ্ধতি : বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে ডান নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া। তারপর ডান নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসকে বাইরে ছাড়া এই ক্রিয়াকে অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম বলে।

করার পদ্ধতি বিভাগ : (১) বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া, ডান নাক বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরা। বিভাগ : (২) মধ্যমা, অনামিকা দিয়ে বাঁ নাক ধরা, ডান নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা। বিভাগ : (৩) ডান নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া বাঁ নাক অনামিকা ও মধ্যমা দিয়ে চেপে ধরা। বিভাগ : (৪) ডান নাক বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরা বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া এটাই হলো একবার। এই প্রাণায়ামটি ৩-৫ মিনিট অভ্যাস করা। হাঁপানি ও হার্ট-এর রোগীর ধীরে ধীরে করা উচিত। প্রয়োজনে সময়ে মাত্রা বাড়াতে পারেন।

উপকারিতা : এই প্রাণায়াম দ্বারা ৭২ কোটি, ৭২ লক্ষ ১০ হাজার ২১০ নাড়ী শ্রেণিশুদ্ধ হয়ে যায় তার ফলে দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ, কান্তিময় ও বলবান হয়। এমনকি প্রতিটি কোষকে সজাগ করে, সন্ধিবাত, গেঁটেবাত, স্নায়ুদুর্বল, মূত্ররোগ, ধাতুরোগ, অম্ল-পিত্ত, সর্দি, কাশি, জ্বর, সাইনাস, হাঁপানি, হার্ট ব্লকেজ, প্যারালাইসিস, কোলেস্টেরল, চক্ষু শক্তির বিকাশ হয়। এমন কি বুদ্ধি শক্তির জন্য বিশেষ ফলদায়ী এছাড়া শরীর সুস্থ ও মন শান্ত হয়। নকারাত্মক চিন্তা দূর হয়। আনন্দ উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়ে নূতন দিগন্ত তৈরি করে।

পঞ্চম প্রক্রিয়া : ভ্রামরী প্রাণায়াম

এই প্রাণায়ামটি করার সময় ভ্রমরের ধ্বনির ন্যায় একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হয় নাসারন্ধ্র থেকে। তাই এর নাম হয়েছে ভ্রামরী। এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রাণায়াম। চিত্তের প্রফুল্লতা বর্ধিত হয়। এটি জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রকাশ প্রাণায়াম বলা হয়। এর দ্বারা জ্ঞান বিবর্ধিত হয়।

পদ্ধতি : সুখাসনে/পদ্মাসনে বসে করা উচিত। মেরুদণ্ড সোজা এবং চোখ বন্ধ রাখতে হবে। দুই কানের ফুটো দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। বাইরের আওয়াজ যেন শুনতে না পাওয়া যায়, বাকি আঙ্গুলগুলো অর্থাৎ তর্জনী চোখের ভ্রূ-র উপর, কনিষ্ঠা, অনামিকা আর মধ্যমা দিয়ে দুটি চোখকে হাল্কাভাবে চেপে ধরুন। যেন চোখে জোর না পড়ে। মুখ বন্ধ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস ভিতরে (পূরক) টেনে নিতে হবে তারপর ভ্রমর বা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো ওম্ আওয়াজ বার করতে করতে নাক দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত ভাবে শ্বাস বাইরে (রেচক) বার করতে হবে। সেই সঙ্গে তর্জনীর উপরিভাগ অর্থাৎ মাথার খুলির সামনের ভাগে (ভ্রূ-র উপরের ভাগ) কম্পন অনুভব হবে। এই ক্রিয়া কমপক্ষে ৩ বার করা উচিত। বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে কান যখন বন্ধ করবেন তখন বাইরের শব্দ আর শুনতে পাওয়া যাবে না। মাত্রা ৩ সেকেন্ডে মধ্যম গতিতে শ্বাস নিয়ে তারপর সেই শ্বাস দশ সেকেন্ডে ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে... এবং ওম্ শব্দোচ্চারণ করা।

উপকারিতা : এই প্রাণায়াম মনের চঞ্চলতা দূর হয়। মানসিক, চাপ, উত্তেজনা, উচ্চরক্ত চাপ, হৃদরোগ কমে জ্ঞান ও মেধা বর্ধিত হয়। এছাড়া চক্ষু ও কর্ণ শক্তির বিকাশ হয়।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া : উজ্জায়ী প্রাণায়াম

পদ্ধতি : জ্ঞান মুদ্রাতে মুখ ও চোখ বন্ধ অবস্থায় বসা। গলাকে সংকুচিত করে শ্বাস নিন। তখন শুধু শ্বাসের শব্দ শুনতে পাবেন। এরপর শ্বাস বন্ধ করুন, থুতনি নেমে আসবে, কণ্ঠকূপে অর্থাৎ জলন্ধর বন্ধ। যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ অন্ত কুম্ভকে থাকুন। মনে রাখতে হবে শ্বাস গ্রহণের সময় তলপেট মেরুদণ্ডের দিকে আকর্ষণ হয়। কমপক্ষে ১০/১৫ সেকেন্ড (কুম্ভক) শ্বাস ভিতরে ধরে রেখেছেন তারপর আর যখন পারবেন না তখন মাথা ধীরে ধীরে তুলে ডান নাক বন্ধ করে বাম্ নাক দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। মনে রাখতে হবে মাথা ওঠাবার সময় কিন্তু শ্বাস ছাড়া যাবে না। মাথা ওঠানো শেষ হলেই ডান নাক বন্ধ করে বাম নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়তে হবে। এই প্রাণায়াম ঘড়িটাও করতে পারেন তা হলে দুই হাত কোমরে রেখে করতে হবে।

উপকারিতা : এই প্রাণায়াম করতে শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়। সারা বছর অধিক সর্দি-কাশিতে যাঁরা ভোগেন তাঁদের জন্য উৎকৃষ্ট। টনসিল, থাইরয়েডের সমস্যা, অনিদ্রা, টেনশন, রক্তচাপ, হাঁপানি, অজীর্ণ, অ্যালার্জি, টি. বি., বাচ্চাদের তোতলামি সেরে যায়। গলা নীরোগ এবং মধুর হয়। এছাড়া যাদের নাক-ডাকা রোগ ভাল হয়। মাত্রা ৩ থেকে ৫ বার।

নৃত্যাঞ্জলির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হল-এ অনুষ্ঠিত হলো **নৃত্যাঞ্জলী ডান্স অ্যাকাডেমির** প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পার্থপ্রতিম হাজরা এবং সহ সভাপতি ছিলেন দিলীপ কুমার দাস ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা পুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা ও জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিধায়িকা স্মিতা বক্সী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ধ্রুপদ ও সৃষ্টিশীল নৃত্যের মধ্যে একটি জমজমাট নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা ও উপস্থাপনা করলেন পুনম, রিঙ্কি ও শুভজিৎ।

বিশ্ব একতা ও ভ্রাতৃত্ব দিবস

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের স্মরণে বিবেকানন্দ কেন্দ্র কলকাতা মহানগর শাখা বিগত এক মাস ধরে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিশ্ব একতা ও ভ্রাতৃত্ব দিবসটি যথোচিত মর্যাদায় পালন করেছে। এই পরিক্রমার শেষ পাদে কলকাতার সুপরিচিত টাকি হাউসে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গত ৪ অক্টোবর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এর আগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজীর ভাষণের অংশবিশেষ-নির্ভর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এদিন বিদ্যালয়ের সভাঘরে ওই প্রতিযোগিতার প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে সৈকত দে, অভিজিৎ মজুমদার এবং অভীক সরকার ও জয়দীপ হালদারকে (যুগ্মভাবে তৃতীয়) কেন্দ্রের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার নেওয়ার আগে এই ছাত্ররা বিবেকানন্দের অনন্ত জীবন ও কর্মের ওপর চিন্তা ও চেতনাদর্শী আলোকপাতও করে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রথামাফিক স্বামীজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য মদলাচরণ গীতের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একনিষ্ঠ বিবেকানন্দ অনুরাগী ও কর্মী পরেশ নন্দ উদ্দীপক ভাষণ দেন ছাত্রদের উদ্দেশে। তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বসভ্যতায় বিবেকানন্দই একমাত্র রক্ষাকবচ। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের মহানগর প্রমুখ মালবিকা চট্টোপাধ্যায় সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও দেশজুড়ে এর কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন বাপ্পাদিত্য দেবনাথ। আর কৌশিক সরকারের কণ্ঠমাধুর্যমণ্ডিত সঙ্গীত বিশেষ মাত্রার সঞ্চার করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন অন্যতম শিক্ষক নিবেদিতা রায়।

সমাবেশ সমাচার

হালিশহরে যুব সম্মেলন

গত ২ অক্টোবর উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের বেশিরভাগের বয়সই ৪০ বছরের নীচে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সংযোজক দিলীপ ঘোষ, সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ মদন বিশ্বাস, জেলা প্রচারক সুদীপ তিওয়ারি ও উত্তর ২৪ পরগণা সহ বিভাগ প্রচারক সঞ্জয় মণ্ডল, নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ত্রিলোকী প্রসাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রদান মহাদান

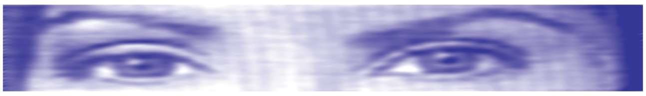

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বিশেষ নিবন্ধ

দিল্লীর বর্তমান রাজনীতি এবং রাজ্য বিজেপি

শ্যামল কুমার হাতি

সম্প্রতি আমাদের দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির এক ভীষণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এর আগে বিজেপির নেতৃত্বে দেশের পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই অবরোধ তৈরি হয়েছিল। পার্লামেন্ট চলতে পারেনি। কয়লা ব্লক বন্টনের বিরাট পরিমাণ চুরি ধরা পড়ার পর দেশের প্রধান বিরোধীদল কয়লা মন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছিল। সি এ জি-র দেওয়া তথ্য অনুসারে এই কয়লা বন্টনে দেশের লোকসান হয়েছে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। বিজেপির এই ভাবে তেড়েফুঁড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণে দেশের জনগণ খুশি হলেও কংগ্রেস নেতারা, মুলায়ম, লালু প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ খুশি হতে পারেনি। এরা তো সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। আবার ইউ পি এ দুই-এর সৎ শরিক চুপ ছিল। ইউ পি এ সরকারকে সাঁড়াশির মতো বিজেপি চেপে ধরেছিল। তাতেই মনমোহন-সোনিয়ার প্রাণপাখী বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সম্মান মাটিতে মিশে যেতে বসেছিল। দেশের তামাম মানুষ তাকে নিয়ে উপহাস করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। আমাকে তো একটা বাচ্চাছেলে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল। তাতে একটা প্রশ্ন ও তার উত্তরও ছিল। প্রশ্নটা ছিল— 'কয়লা' মুভি এবং 'কয়লা স্ক্যামের' ভিতর কি মিল আছে? উত্তরটা হলো উভয় নায়কই বোবা ছিল। কয়লা সিনেমার নায়কের জিভ জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই সে কথা বলতে পারত না। অন্যদিকে কয়লা স্ক্যামের নায়কও মুখ খোলেনি। এই অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের মন এসব থেকে ঘোরাবার জন্য মনমোহন সিং সাহেব রাতারাতি সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়ে ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৫ টাকা বাড়িয়ে দেন। রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরিবারকে ৬টি সিলিন্ডার (ভর্তুকিসহ) দেওয়া হবে ঘোষণা করেন। তারপর ৭টি থেকে যত প্রয়োজন খোলা বাজার থেকে ভর্তুকি বাদে কিনতে হবে। যার মূল্য বর্তমানে ১০৬২ টাকা পড়বে। আমরা সবাই জানি ডিজেলের দাম বাড়লে সব জিনিষের দাম বাড়বে। আনাজপত্র, চাল, ডাল, তেল, মশলা এমন কি খোলা বাজারে গ্যাসের দামও বেড়ে যাবে। পরিবহন খরচ বাড়লে তো সব জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য। সরকার বলতে শুরু করলেন— না না দাম বাড়বে না। আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডিএ ৭ শতাংশ বাড়িয়ে দিলেন। দুটো কাজই এক সঙ্গে করলেন। দেশের লোককে সোনিয়া-মনমোহন বোকা ভাবে। তা ভাবুক তাতে আমাদের দুঃখ নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী পুঁজির জন্য সরকার দরজা খুলে দিল। বিমান পরিবহণে ৪৯ শতাংশ, খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ এবং একক খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ-র সঙ্গে মিডিয়া এবং ডি টি এ-তে ৭৪ শতাংশ বিদেশী পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। এতেও মনমোহন সিংহের পেট ভরেনি। দেশের ৫টা 'নবরত্ন' পাব্লিক সেক্টর ইউনিটকেও নতুন করে আরও বিলগ্নিকরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। এই বিলগ্নিকরণে সরকারের আয় হবে ১৫০০০ কোটি টাকা। দেশের সমস্ত স্তরের মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক ডি এম কে এবং সমর্থনকারী দল সমাজবাদী পার্টিও বিজেপির ডাকা ২০ সেপ্টেম্বরের ভারত বন্ধে যোগদান করল। আমাদের রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীও রাস্তায় নামলেন। সরকারকে ৭২ ঘণ্টা সময় দিলেন। সরকারের মত পরিবর্তনের জন্য। তাতে সরকার রাজী না হওয়ায় ৪০ মাসের ইউ পি এ সরকারের সংসার থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবেন বলে হুঙ্কার দিলেন। সরকারের সব দুর্নীতির বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলবেন বলেও হুঙ্কার দিলেন। অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেসও মমতা সরকার থেকে বেরিয়ে গেল। এটা হলো একটা সামগ্রিক পরিস্থিতি।

ডঃ মনমোহন সিং বলেছেন, ১৫ মাসে ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়নি। যদি বাড়াতে হোত তাহলে ১৭ টাকা বাড়াতে হোত। জনগণের দুঃখ কষ্ট হবে ভেবে মাত্র ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন— গত ১৫ মাসে কেন বাড়ানো হলো না। তবে কি সরকার রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন? ডঃ মনমোহন সিং মহাশয় জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন— দেশের পরিস্থিতি ১৯৯১ সালের মতো হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, এন ডি এ সরকার যখন চলে গিয়েছিলেন তখন মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩ শতাংশ। এখন তা ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। Standard & Poor জানিয়েছে ২০১২-২০১৩ সালে ভারতের উন্নয়নের হার হবে ৫.৫ শতাংশ। যা নাকি ওরা আগে বলেছিল ৬.৫ শতাংশ। আজ এত নেগেটিভ গ্রোথ হচ্ছে কেন? আসলে এসবই হচ্ছে ওদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও চরম দুর্নীতির কারণে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Friedman এর মতে "corruption is also an important cause of fiscal drain and higher inflation in developing societies. These is strong evidence that countries with high level of corruption tent to have lower collection of tax revenues in relation to their national incomes."

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সরকার বাজার থেকে টাকা তুলতে চাইছে। এফ ডি আই ওপেন করে দিয়েছে। দেশের ৫ কোটি দোকানদারের ক্ষতি হবে। মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মরবে। ওদের আট বছরের শাসনকালে দেশ ফোঁপড়া হয়ে গেছে। সরকারের মনে রাখা উচিত ছিল জনগণের কাছে এমন কোনও গাছ নেই যা নাড়লেই টাকা পাওয়া যাবে। বিদেশী পুঁজি আমাদের বৃহৎশিল্পে আসতে পারত, বিদ্যুতে শিল্পেও আসতে পারত। রাস্তাঘাট তৈরিতেও ব্যবহার হতে পারত। এসব না করে ছোটছোট দোকানদার, সাধারণ চাষীদের মারার ব্যবস্থা করেছে। যে ওয়ালমার্ট-কে রেড কার্পেট পেতে মনমোহন স্বাগত জানাচ্ছে আজ আমেরিকাতে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে।

মমতা যতই এ সবের বিরোধিতা করুক ৪০ মাস চুপ থাকার জন্য তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। টি এম সি-কেও অনেক মূল্য দিতে হবে। এরাজ্যে মানুষ তাদের শাসন দেড় বছর দেখেছে। ওরা কীভাবে কাজ করছে কীভাবে সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করছে মানুষ তাও দেখেছে। তাই এবার পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ সিপিএম-টি এম সি ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখাবে। এবার বিজেপি-কে তৈরি থাকতে হবে। এর আগে এন ডি এ যখন সরকার গড়েছিল তার সুযোগ নিয়ে বিজেপি রাজ্যে সেভাবে সংগঠন করতে পারেনি। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে নেয় তেমনি বড় টি এম সি-র জন্য বিজেপি বাড়তে পারেনি। এখন আর অতটা মমতা ম্যাজিক নেই। তবে যেটা কম সেটা হলো পাকা মাথার প্রবীণ মানুষ। এবার তাদের নিয়ে চললেও লাভ বই লোকসান নেই। মনে রাখতে হবে এ রাজ্যে বিজেপির অবস্থা অভিমন্যুর মতো। তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে সবাই এক।

একই কথা মাথায় রেখে টি এম সি এবং সিপিআইএম ও বামফ্রন্ট এক যোগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। মনে রাখতে হবে দুষ্টের ছলের অভাব হবে না। বিজেপি-কে তাই আরও সতর্ক ও সাবধানে পা ফেলতে হবে।

খেলা

আই লিগ গোয়ার, ফেড-কাপ ইস্টবেঙ্গলের সম্পত্তি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবছরে ফেড-কাপ জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলারদের উল্লাস।

এ খেলা চলছে নিরন্তর। এই খেলার পশ্চাদ্‌পট, পটভূমি সবই ছকে বাঁধা। তার রহস্যভেদ করবে কোন্‌ ব্যোমকেশ? বছরের পর বছর একই তামাশা, একই প্রহসন দেখে দেখে বিরক্ত এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। তাতে অবশ্য কোনও হেলদোল নেই ফেডারেশন কর্তা থেকে আই এম জি-র। না আর ধ্বন্দে রেখে লাভ নেই পাঠককে। আসা যাক বিষয়ের অবতারণায়। এদেশের ফুটবলে দুই সর্বোচ স্তরের প্রতিযোগিতা হচ্ছে আই লিগ ও ফেডারেশন কাপ। আর সেই দুই প্রতিযোগিতায় গোয়ার ডেম্পো ও কলকাতার ইস্টবেঙ্গল বিজয়কেতন উড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর। ভারতবর্ষে আর কি কোনও টিম নেই যারা আই লিগ ও ফেডকাপ জিততে পারে? এবার নিয়ে টানা চার বছরে তিনবার ফেডকাপ জেতা হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের। আর মাঝে যে একবার ট্রফি আসেনি লাল-হলুদ তাঁবুতে, তাতে অবশ্য কলকাতার মুখে চুনকালি পড়েনি। কারণ সেবার ফেডকাপ ঘরে তুলেছিল মোহনবাগান। অর্থাৎ পাঠক কি বুঝলেন দেশের দুটি অগ্রগণ্য ফুটবল রাজ্যকে খুশি করার জন্য আই লিগ ও ফেডকাপের ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে গাণিতিক নিয়মে।

ক্রিকেটে যেমন ভারতীয় বোর্ডের অঙ্গুলিহেলনে চলে আই সি সি। বি সি সি আইয়ের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে আই সি সি। আই সি সি নির্ধারিত বা পরিচালিত সব টুর্নামেন্টের আগে তাই টেবিলে বসে ঠিক হয়ে যায় কোন ম্যাচে কি ফলাফল হবে। মোটের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট যেন সম্মানজনক অবস্থানে থাকে। তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য মুনাফা সব লোটা যাবে। তাই এই সময়কার সব টুর্নামেন্টের ফলাফল দেখে প্রকৃত ক্রিকেটিয় দক্ষতা ও মানদণ্ড বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি। অনেকটা সেরকমভাবেই আবর্তিত হচ্ছে ভারতীয় ঘরোয়া ফুটবলের দিকচক্রবাল। গোয়া ও বাংলা, ভারতীয় ফুটবলে প্রাণসঞ্চারকারী দুই রাজ্য। ফেডারেশনের কোষাগার স্ফীত করার চালিকাশক্তি তাই আই লিগ ও ফেডকাপ প্রতি বছর জিতবে ওই দুই রাজ্যের দুই ক্লাব। পাঞ্জাব, মুম্বাই, কেরল যথেষ্ট শক্তিশালী রাজ্য। গোয়ারই আরও ২/৩টি ক্লাব সর্বভারতীয় স্তরে সমাদৃত। যেমন চার্চিল ব্রাদার্স, সালগাঁওকর। তারা কালেভদ্রে জেতে আই লিগ।

আর পাঞ্জাব বা মুম্বাইয়ের দলগুলি যতই ভাল খেলুক তারা আই লিগ জিতবে না। সেই কবে প্রথম আই লিগের সময় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল জে সি টি। আর ২০০৩-এ মুম্বাইয়ের মাহিন্দ্র ইউনাইটেড। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দুটি দলই সম্প্রতি আই লিগ থেকে নাম তুলে নিয়েছে। ফেডারেশনের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এর ফলে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ওই দুই রাজ্যের অগণিত কিশোর-তরুণ প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারের। জে সি টি ও মাহিন্দ্রা শুধু চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য টিম গড়ে না। তারা ভবিষ্যতের ফুটবলারদের তুলে আনার কাজটিও নিষ্ঠা সহকারে করত। যদিও আই লিগ বা ফেডারেশন কাপ খেলছে না জে সি টি। কিন্তু তাদের অ্যাকাডেমিটি এখনও বলবৎ রয়েছে। তবে সর্বভারতীয় স্তরে ম্যাচ না খেললে তরুণ ফুটবলারদের বিকাশ হবে কীভাবে? ফেডারেশনের কি কোনও দায়িত্ব নেই যাতে জেসিটি ও মাহিন্দ্রা আবার ফিরে আসে জাতীয় ক্লাব ফুটবলের মূলস্রোতে। নিজেদের মানসিকতা একটু বদলিয়ে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিকল্পে গঠনমূলক কাজ করতে কি এতই অপারগ ফেডারেশন কর্তারা?

ভারত সম্প্রতি নেহরুকাপ জিতেছে। এর পরের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট কবে কোথায় খেলবে তা কেউ জানে না। অথচ হল্যান্ড থেকে দুজন বিখ্যাত কোচিং ব্যক্তিত্বকে আনা হয়েছে ভারতীয় দলকে নিয়ে কাজ করবার জন্য। তাদের পরামর্শ শোনার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই কর্তাদের। শুধুমাত্র দেশের মাঠে একটা নেহরু টুর্নামেন্ট হয় আর তাতে নিয়মমাফিক চাম্পিয়ন হয়েই যেন ভারতীয় ফুটবল দলের যাবতীয় অস্তিত্বকে মেলে ধরা। বিদেশের মাঠে টুর্নামেন্ট খেলা ভুলেই গেছে ভারত। ওই যখন প্রি-অলিম্পিক বা প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা পড়ে তখন দেশে-বিদেশে কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ ঘটে ভারতীয় ফুটবলারদের। আর আছে চারবছর অন্তর এশিয়ান গেমস। বছরে ফিফা প্রীতি ম্যাচও বা কটা খেলে ভারত? আর খেললেও তো ওই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইয়েমেনের সঙ্গে। যেসব দেশ মোটামুটি ভারতেরই সমতুল্য। এতে না বাড়ে ফিফা র‍্যাঙ্কিং, না হয় মান ও মাত্রার উত্তরণ। ফেডারেশন কর্তারা ও জাতীয়দলের স্পনসর আই এম জি রিলায়েন্স কারুরই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা উন্নত চেতনা নেই। তাই দেশের ঘরোয়া ফুটবলের গঠনতন্ত্র ও কাঠামো পরিবর্তন করে তাতে গতি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা হচ্ছে না। প্রতি বছর গতানুগতিক ভাবে আই লিগ ও ফেডারেশন কাপ হচ্ছে, দর্শক আকর্ষণ কমছে, আর খেলার ফলেও থাকছে না কোনও ব্যতিক্রম।

শব্দরূপ-৬৪৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

					১		২
	৩		৪				
৫			৬				
৭							
				৮			
		৯					
				১০			
১১							

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মুন্সী প্রেমচন্দের বিখ্যাত গল্প, ৩. অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের গুপ্তচর; অপ্রিয়সত্যবাদী, ৬. রেশমী কাপড় বিশেষ, ৭. কলকাতার বিমানবন্দর, ৮. গণেশ, ৯. খাজনা আদায়কারী কর্মচারী বিশেষ, ১০. বরফ, ১১. প্রাচীন দেশ বিশেষ (আধুনিক বিহারের অন্তর্গত)।

উপর-নীচ : ১. গোরুর খুরের চাপে মাটিতে যে দাগ বসে, ২. সকল ঋতুতে বা সর্বকালে আনন্দদায়ক ইন্দ্রভোগ্য স্বর্গের উদ্যান, ৪. ব্যোমচারী; পক্ষী; জনৈক মুনি, ৫. হিমালয়ক্রোড়স্থ গাড়বাল প্রদেশের অলকানন্দা নদীতীরবর্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ, ৮. স্বৈরিণী; কুলটা, ৯. রত্ন বিশেষ; শেষ দুয়ে চর্বি।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪২

আঁ			হ	স্তা	ক্ষ	র	
ক	ল		জ		প		
শি	ব	দ্রু	ম		ণ		
	কু			বি	ক	চ	
	শ	র	ৎ			ন্দ্রা	
		স		প্র	তি	ব	ল
		ক		জ্ঞা		লী	লা
	ব	লি	দা	ন			ম

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৪৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ ডিসেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ১৭

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

প্রকাশিত হল

প্রকাশিত হল

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত • সুমিত্রা ঘোষ • বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়— রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। **তিলকের প্রথম কারাবরণ : শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। **রাষ্ট্রপরিচালনায় 'খড়ের মানুষের' উপদ্রব**— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। **বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ**—তথাগত রায়। **ভারত বনাম ইন্ডিয়া**— অমলেশ মিশ্র। **গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন**— দেবীপ্রসাদ রায়। **বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদর্শন ও জাতীয়তাবোধ**— অচিন্ত্য বিশ্বাস। **রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা**— সমিত দে। **আন্দামান দর্শন**— দীনেশ চন্দ্র সিংহ। **রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** — সত্যনারায়ণ মজুমদার। **রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শতবর্ষ : দেশে দেশে ডাকঘর**— বিকাশ ভট্টাচার্য। **সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা**— সন্দীপ কুমার দাঁ। **বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা**— অর্ণব নাগ। **মাধেরার সূর্যমন্দির**— সৌমেন নিয়োগী।

—: গল্প :—

রমানাথ রায় • শেখর বসু • গোপালকৃষ্ণ রায় • জিষ্ণু বসু • দীপঙ্কর দাস • রত্না ভট্টাচার্য • গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

ধামালি— চণ্ডী লাহিড়ী। **ডি লা গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক ইয়াক**— পিনাকপাণি ঘোষ।

—: ভ্রমণ :—

সিন্ধু দর্শনে— বিজয় আঢ্য।

—: দেবীবন্দনা :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী— ভিক্ষুদেব ভট্ট

সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা

।। দাম : ৬০ টাকা।।